কার্ল আলেকজান্ডার নুবার্গ

তৃতীয় অধ্যায়

কোষ রসায়ন (CELL CHEMISTRY)

কোষ রসায়ন গবেষণাগার

ভূমিকা (Introduction) : জীবদেহের গঠন ও কাজের একক হলো কোষ। আর কোষ হলো বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক পদার্থের সংযুক্তির ফসল। এক একটি কোষ এক একটি জীবন। প্রতিটি সজীব কোষ এক একটি পরীক্ষাগার বিশেষ। সে কারণে প্রতিটি জীবন্ত কোষে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলে। এ প্রক্রিয়াগুলোকে একত্রে বিপাক (metabolism) বলে। জীব এসব প্রক্রিয়ার কাঁচামাল সরাসরি পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করে অথবা বিভিন্নভাবে সংশ্লেষ করে। জীবকোষে প্রাপ্ত সকল প্রকার জৈব-রাসায়নিক বস্তুতে যেমন রয়েছে গঠনগত ভিন্নতা তেমনি রয়েছে আচরণগত বিচিত্রতা। এক একটি জৈব-রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে বিবিধ প্রক্রিয়ায় ঘটছে অসংখ্য প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়া।

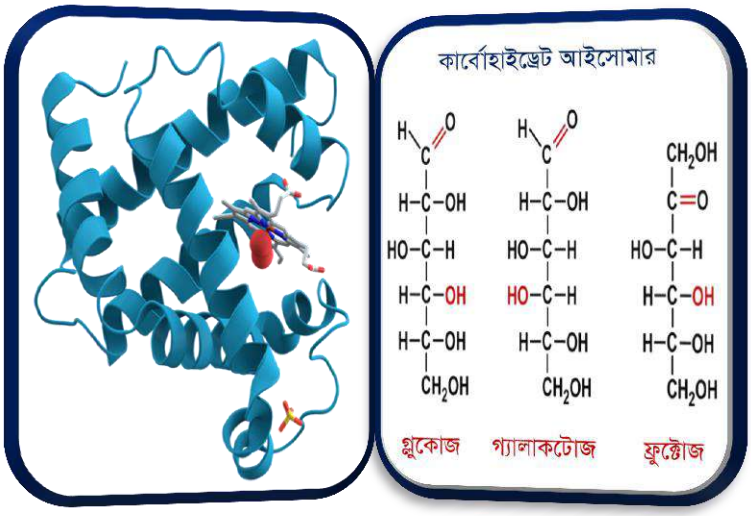

জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীব তথা কোষের বিভিন্ন প্রাণ-রাসায়নিক প্রক্রিয়া, বিক্রিয়া, গঠন, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, রাসায়নিক উপাদানের প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা করা হয় তাকে জৈব রসায়ন বলে।

জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল আলেকজান্ডার নুবার্গ (Carl Alexander Neuberg, 1877-1956) জৈব রসায়নের প্রথম দিকের অগ্রগামী ছিলেন এবং তাকে প্রায়শই আধুনিক জৈব-রসায়নের জনক" হিসাবে অভিহিত করা হয়। তার মতে, প্রাণ-রসায়ন হলো- Chemistry of living things। একটি কোষের সমস্ত রাসায়নিক উপাদানের আচরণবিধি ও কার্যপ্রণালিই হলো কোষ রসায়ন (cell chemistry)।

কোষস্থ নানা প্রকার জৈব-রাসায়নিক বস্তুগুলোকে আমরা কয়েকটা প্রধান গ্রুপে ভাগ করতে পারি। যেমন- কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড, ভিটামিন, হরমোন, এনজাইম, বিভিন্ন প্রকার জৈব অ্যাসিড ইত্যাদি। শর্করা, প্রোটিন ও লিপিডে শক্তি সঞ্চিত থাকে, যা জীব বিপাক প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে। এজন্য এদেরকে জীবদেহের জৈব জ্বালানি বলা হয়। উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের মধ্যে যেমন জৈব-রাসায়নিক চরিত্রে অনেক মিল আছে, তেমনি বহু পার্থক্যও রয়েছে। তা সত্তেও যে কোনো সজীব জীবদেহে ৬০-৯০% পানি থাকে। অবশিষ্ট যে জৈববস্তু ও অজৈব পদার্থ থাকে তাদের বিশ্লেষণ করলে প্রধানত ১৬টি মৌল পাওয়া যায়। এগুলো হলো- C, H, O, N, P, Ca, Mg, K, Fe, Na, Cl, Mn, B, S, Zn এবং Cu।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা শিখবে (Learning Outcome)	পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan)
১। জীবের রাসায়নিক উপাদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।	পাঠ-১ : জীবদেহে কার্বোহাইড্রেটের ভূমিকা ও শ্রেণিবিন্যাস।
২। কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিডের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা করতে পারবে।	পাঠ-২ : মনোস্যাকারাইড।
৩। জীবদেহে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিডের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।	পাঠ-৩ : অলিগোস্যাকারাইড।
৪। উৎসেচক-এর ক্রিয়ার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।	পাঠ-৪ : পলিস্যাকারাইড।
৫। উৎসেচক-এর শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা করতে পারবে।	পাঠ-৫ : প্রোটিনের শ্রেণিবিন্যাস ও ভূমিকা।
৬। বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে উৎসেচক-এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবে।	পাঠ-৬ : লিপিডের শ্রেণিবিন্যাস ও ভূমিকা।
	পাঠ-৭ : উৎসেচকের শ্রেণিবিন্যাস।
	পাঠ-৮ : উৎসেচকের কর্মপদ্ধতি ও গুরুত্ব।

প্রধান শব্দ (Key words) : কার্বোহাইডেট, মনোস্যাকারাইড, ডাইস্যাকারাইড, অলিগোস্যাকারাইড, পলিস্যাকারাইড, হোমোপলিস্যাকারাইড, হেটারোপলিস্যাকারাইড, L-গ্লুকোজ, D-গ্লুকোজ, α-গ্লুকোজ, β-গ্লুকোজ, সুক্রোজ, রাইবোজ, ডিঅক্সিরাইবোজ, গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন, নিউক্লিওসাইড, নিউক্লিওটাইড, অ্যামিনো এসিড, পেপটাইড বন্ধন, ডাইপেপটাইড, ট্রাইপেপটাইড, অলিগোপেপটাইড, পলিপেপটাইড, এনজাইম, সাবস্ট্রেট, অ্যাকটিভ সাইট, পলিমার, স্টেরয়েড।

জীবের রাসায়নিক উপাদান (Chemical components of the organism) : কোষ হলো জীবদেহের গঠন ও কাজের একক। কোষে জীবন ধারনের সব উপাদান তৈরি হয় এবং বিরাজ করে। জীবদেহের গঠন ও জৈবিক কার্যক্রম নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদানের গঠন, বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্যের উপর। জীবদেহে অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকম সরল ও জটিল রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। জীবের বৃদ্ধি ও বিকাশে এসব রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োজন হয়। জীবদেহে বিদ্যমান রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে মিল থাকলেও বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। সজীব পদার্থের কোষে উৎপন্ন হওয়া বিভিন্ন প্রকার বৃহৎ পলিমার অণু যেমন- শর্করা, প্রোটিন, নিউক্লিক এসিড এবং তুলনামূলকভাবে কিছু ক্ষুদ্র অণু যেমন- প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি বিপাকীয় পদার্থ ও কিছু প্রাকৃতিক পদার্থকে একত্রে জৈব অণু (biomolecules) বলে। জৈব-অণুগুলোর মধ্যে কতকগুলো অতি সাধারণ ও ছোট, এদেরকে মাইক্রোমলিকিউল (micromolecules) বলে। অপরদিকে কিছু সংখ্যেক অণু বৃহৎ আকৃতি ও জটিল গঠন বিশিষ্ট, এদেরকে বলা হয় ম্যাক্রোমলিকিউল (macromolecules)। এসব জৈব-অণু সম্মিলিতভাবে জীবদেহ গঠন করে। জৈব-অণুগুলো জীবের দৈহিক বৃদ্ধি, বিকাশ ও দেহ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিপাক (metabolism) প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। J.T. Borner (১৯৬২)-এর মতে, একটি জীবকোষে মোট ২ x ১০^{১৪} টি অণু রয়েছে। J.D. Watson (১৯৬৫)-এর মতে *Escherichia coli*-এর একটি কোষে অন্তত ৩০০-৬০০টি বিভিন্ন প্রকারের অণু রয়েছে।

বিজ্ঞানের যে শাখায় কোষস্থ বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক উপাদানগুলোর গঠন, বর্ণনা, পঠন-পাঠন ও গবেষণা করা হয় তাকে জৈব রসায়ন (Biochemistry) বলা হয়।

জীবদেহে বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদানগুলোকে মোটামুটি দুটি শ্রেণিভূক্ত করা যায়, যথা-

(ক) অজৈব বস্তু (Inorganic materials) : যেসব রাসায়নিক বস্তুতে কার্বন ও হাইড্রোজেন থাকে না, তাদের অজৈব বস্তু হিসেবে গন্য করা হয়। অজৈব বস্তুর মধ্যে পানি, খনিজ লবন, বহু প্রকার আয়ন ও পানিতে দ্রবীভূত গ্যাস উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে পানির পরিমাণই বেশি। পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহের ওজনের ৬০-৭০% পানি। সাধারণভাবে বলতে গেলে, জীবদেহের ৭০-৮০% পানি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। শুস্কবীজে পানির পরিমাণ ৫-১০%। জীবকোষে মুখ্য খনিজ (major mineral), যেমন (Ca, P, Na, Cl, O, Mg, S, K ও N) এবং গৌন খনিজ (minor mineral), যেমন- (Fe, Ca, Co, Mn, Mo, Zn, F, I, Cr ও Se) নামক বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কোষের জন্য বেশি পরিমাণে প্রয়োজন এমন মৌলগুলোকে (যেমন- N, P, K, Mg, S, Ca ও Fe) ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট (macronutrient) এবং অল্প পরিমাণে প্রয়োজন এমন মৌলগুলিকে (যেমন- Mn, Zn, B, Ca, Co, Mo, Cl, ও Ni) মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট (micronutrient) বলা হয়।

(খ) জৈব দ্রব্য (Organic materials) : যেসব কোষীয় বস্তুর রাসায়নিক গঠনে কার্বন ও হাইড্রোজেন থাকে, তাদের জৈব দ্রব্য হিসেবে গন্য করা হয়। উল্লেখযোগ্য জৈব দ্রব্য হচ্ছে- কার্বোহাইড্রেট, অ্যামিনো এসিড, প্রোটিন, লিপিড, এনজাইম, নিউক্লিক এসিড, হরমোন, ভিটামিন ইত্যাদি। জীবদেহে যত রকমের জৈব দ্রব্য বা জৈব যৌগ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, লিপিড ও প্রোটিনের পরিমানই সর্বাধিক। এই তিন উপাদানের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট ও লিপিড প্রধানত শক্তি উৎপাদক পদার্থ হিসেবে এবং প্রোটিন মূলত দেহ গঠনকারী পদার্থ হিসেবে অবস্থান করে।

নিম্নোক্ত সারণির মাধ্যমে কোষে বিদ্যমান এসব উপাদান উপস্থাপিত হলো-

কোষের প্রধান জৈব অণু
(Main organic molecule of the cell)

ক্রম	প্রধান রাসায়নিক উপাদান	শতকরা হার	পদার্থের ধরন
১।	পানি	৮০.০০	অজৈব
২।	অবৈজ লবণ	১.০০	
৩।	কার্বোহাইড্রেট	১.০০	জৈব
৪।	লিপিড	০.৫০	
৫।	প্রোটিন	১২.০০	
৬।	নিউক্লিক এসিড	২.০০	
৭।	অন্যান্য জৈব পদার্থ	০,৫০	

কোষের প্রধান রাসায়নিক মৌলিক অণু
(Main chemical element molecule in the cell)

ক্রম	রাসায়নিক উপাদান	শতকরা হার	ক্রম	রাসায়নিক উপাদান	শতকরা হার
১।	অক্সিজেন	৬২.০০	৮।	সালফার	০.১৪
২।	কার্বন	২০.০০	৯।	পটাসিয়াম	০.১১
৩।	নাইট্রোজেন	১০.০০	১০।	সোডিয়াম	০.১০
৪।	হাইড্রোজেন	৩.০০	১১।	ম্যাগনেসিয়াম	০.০৭
৫।	ক্যালসিয়াম	২.৫০	১২।	আয়োডিন	০.০১৪
৬।	ফসফরাস	১.১৪	১৩।	আয়রন	০.১০
৭।	ক্লোরিন	০.১৬	১৪।	কপার, জিঙ্ক ইত্যাদি	০.৭৫৬

জীবকোষের প্রধান প্রধান জৈব-রাসায়নিক পদার্থ (Main biochemical substances in the cell) :

পদার্থের নাম	উদাহরণ	পদার্থের নাম	উদাহরণ	পদার্থের নাম	উদাহরণ
কার্বোহাইড্রেট	গ্লুকোজ, স্টার্চ, সেলুলোজ	এনজাইম	কার্বোক্সিলেজ, লাইগেজ	ভিটামিন	ভিটামিন-এ, বি, সি
প্রোটিন	অ্যালবুমিন, হিমোগ্লোবিন	কো-এনজাইম	NAD, NADP, ATP	হরমোন	ইথিলিন, ইস্ট্রোজেন
লিপিড	তেল, চর্বি, মোম	নিউক্লিক এসিড	DNA, RNA	জৈব এসিড	অ্যাসিটিক এসিড
অ্যামিনো এসিড	গ্লাইসিন, হিস্টিডিন	রঞ্জক	ক্লোরোফিল, হিমোগ্লোবিন	অ্যান্টিবায়োটিক	পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাসিন

কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা (Carbohydrates) : জীবের শক্তির ভান্ডার ও উদ্ভিদের গঠনশৈলীর প্রধান উপাদান হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা হলো এক দরনের জটিল প্রাকৃতিক জৈব যৌগ যা প্রধানত কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মৌল নিয়ে গঠিত। কার্বোহাইড্রেটে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু ১ : ২ : ১ অনুপাতে যুক্ত থাকে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কার্বন ও পানি থেকে সবুজ উদ্ভিদে কার্বোহাইড্রেট তৈরি হয় এবং তাদের দেহ বা দেহকোষে অংশভূত করে। প্রাণিরা উদ্ভিদের কাছ থেকে এটি গ্রহণ করে থাকে। এদের সাধারণ আণবিক সংকেত হচ্ছে $(CH_2O)n$। এখানে n হলো ৩ বা তদুর্ধ্ব সংখ্যা। যেমন- গ্লুকোজের সংকেত $C_6H_{12}O_6$।

যেসব অ্যালডিহাইড বা কিটোন জাতীয় যৌগে অনেকগুলো হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকে অথবা যেসব যৌগ আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে অনেকগুলো হাইড্রোক্সিল গ্রুপযুক্ত অ্যালডিহাইড বা কিটোন উৎপন্ন করে, সেসব যৌগকে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট বলে।

কার্বোহাইড্রেটের নামকরণ (Naming of carbohydrates) : ফরাসি 'hydrate de carbone' (অর্থাৎ hydrates of carbon বা কার্বনের হাইড্রেট জাতীয় যৌগ) থেকে কার্বোহাইড্রেট শব্দের উৎপত্তি। কার্বন + হাইড্রেট (হাইড্রেস অব কার্বন) থেকে কার্বোহাইড্রেট কথাটি এসেছে। অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট হলো পানি সমন্বিত কার্বন যৌগ। বাংলায় এর প্রতিশব্দ শর্করা।

কার্বোহাইড্রেটের উৎস (Sources of carbohydrates) : কার্বোহাইড্রেটের প্রধান উৎস হলো উদ্ভিদ। উচ্চশ্রেণির প্রাণিদেহে সামান্য পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট থাকে। উদ্ভিদের কাণ্ড, আuশ, বাকল, ফল-মূল, বীজ, রস ইত্যাদিতে সেলুলোজ ও স্টার্চরূপে কার্বোহাইড্রেট বিদ্যমান থাকে। প্রাণিদেহের যকৃত, পেশি ও দুধে যথাক্রমে গ্লাইকোজেন, ল্যাকটিক এসিড ও ল্যাকটোজেনরূপে কার্বোহাইড্রেট সঞ্চিত থাকে। কার্বোহাইড্রেট দানাদার, তন্তুময় বা স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। এরা স্বাদে মিষ্ট বা স্বাদহীন। কার্বোহাইড্রেটের অধিকাংশই পানিতে আর্দ্রবণীয় তবে মনোস্যাকারাইড পানিতে দ্রবণীয়। এরা অধিক তাপে কার্বনে পরিণত হয়। এরা আলোক সক্রিয়ক এবং আলোক সমানু গঠন করে। কার্বোহাইড্রেট এসিডের সাথে মিলে এস্টার গঠন করে। সরল কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় হেক্সোজ জাতীয় কার্বোহাইড্রেট।

কার্বোহাইড্রেটের বৈশিষ্ট্য (Properties of carbohydrates) :

১। কার্বোহাইড্রেটসমুহ নির্দিষ্ট গঠন ও কাঠামো বিশিষ্ট হয়ে থাকে।
২। এগুলো উদ্ভিদদেহ ও প্রাণিদেহের শক্তির উৎসের এক অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিদ্যমান।
৩। এগুলো দানাদার, তন্তুময় বা স ।ফটিকাকার কঠিন পদার্থ।
৪। এরা স্বাদে মিষ্ট বা স্বাদহীন হতে পারে।
৫। এরা বিজারক বা অবিজারক হতে পারে।
৬। এরা অধিক তাপে কার্বনে পরিণত হয়।
৭। অণুজীব গাঁজন প্রক্রিয়ায় এদেরকে অ্যালকোহলে পরিণত করে।
৮। এরা আলোক সক্রিয়ক এবয় আলোক সমাণুতা প্রদর্শন করে।
৯। এগুলো এসিডের সাথে যুক্ত হয়ে এস্টার গঠন করে।
১০। কতিপয় শর্খরা আইসোমারিজম ধর্ম প্রদর্শন করে।
১১। এদের আর্দ্র বিশ্লেষণে অনুরূপ ধর্ম বিশিষ্ট অ্যালডিহাইড ও কিটোন পাওয়া যায়।

কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of carbohydrates) :

(ক) ভৌত ধর্ম বা স্বাদের ভিত্তিতে (On the basis of physical properties or taste) : ভৌত ধর্ম বা স্বাদের উপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১। স্যুগার (sugar), ২। নন-স্যুগার (non-sugar)।

১। স্যুগার (Sugar) : যে সকল কার্বোহাইড্রেট স্বাদে মিষ্ট, দানাদার, পানিতে দ্রবণীয় এবং আণবিক ওজন সঠিকভাবে জানা যায়, তাদেরকে স্যুগার বলে। যমন- গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ ইত্যাদি।

২। নন-স্যুগার (Non-sugar) : যে সকল কার্বোহাইড্রেট স্বাদহীন, অদানাদার, পানিতে আর্দ্রবণীয় এবং আণবিক ওজন সঠিকভাবে জানা যায় না, তাদেরকে নন-স্যুগার বলে। যেমন- শ্বেতসার, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন ইত্যাদি।

(খ) রাসায়নিক ধর্ম বা বিজারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে (On the basis of chemical properties or oxidation) : রাসায়নিক ধর্ম বা বিজারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১। রিডিউসিং বা বিজারক স্যুগার (reducing sugar :), ২। নন-রিডিউসিং বা অবিজারক স্যুগার (non-reducing sugar :)।

১। রিডিউসিং বা বিজারক স্যুগার (Reducing sugar) : যেসব কার্বোহাইড্রেটে মুক্ত অ্যালডিহাইড (-CHO) বা কিটোন (>C = O) গ্রুপ থাকে এবং ক্ষারীয় আয়নকে বিজারিত করতে পারে, তাদেরকে বিজারক বা রিডিউসিং স্যুগার বলে। যেমন- গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ইত্যাদি।

২। নন-রিডিউসিং বা অবিজারক স্যুগার (Non-reducing sugar) : যেসব কার্বোহাইড্রেটে মুক্ত অ্যালডিহাইড (-CHO) বা কিটোন (>C = O) গ্রুপ থাকে না ফলে ক্ষারীয় আয়নকে বিজারিত করতে পারে না, তাদেরকে অবিজারক বা নন-রিডিউসিং স্যুগার বলে। যেমন- সুক্রোজ, ট্রেহালোজ ইত্যাদি।

(গ) রাসায়নিক গঠন অণুর ভিত্তিতে (On the basis of chemical composition) : রাসায়নিক গঠনের ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১। মনোস্যাকারাইড (monosaccharide), ২। ডাইস্যাকারাইড (disaccharide), ৩। অলিগোস্যাকারাইড (oligosaccharide) ও ৪। পলিস্যাকারাইড (polysaccharide)।

১। মনোস্যাকারাইড (Monosaccharide) : গ্রিকশব্দ mono = এক এবং saccharum = চিনি। এই দুটি শব্দ থেকে মনোস্যাকারাইড শব্দেরে উৎপত্তি। যেসব কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে আর কোনো সরল কার্বোহাইড্রেট একক পাওয়া যায় না, তাদেরকে মনোস্যাকারাইড বলে।

সাধারণভাবে এরা সরল শর্করা নামে পরিচিত। এরা জীবদেহে এককভাবে অথবা অন্যান্য জটিল কার্বোহাইড্রেট তৈরির গাঠনিক একক (building unit) হিসেবে বিদ্যমান থাকে। এদের সাধারণ সংকেত হচ্ছে $C_nH_{2n}O_n$। এদের অণুতে কার্বনের সংখ্যা ৩-১০টি। সরল শর্করা মিষ্টি স্বাদযুক্ত, পানিতে দ্রবণীয়, স্ফটিকাকার ও রিডিউসিং প্রকৃতির। এসব যৌগে একটি মুক্ত অ্যালডিহাইড (-CHO) অথবা কিটোন (‹C = O) গ্রুপ এবং একাধিক হাইড্রোক্সিল (-OH) গ্রুপ থাকে। বেনেডিক্ট দ্রবণের $Cu(OH)_2$ অংশটি উক্ত স্যুগারের অ্যালডিহাইড বা কিটোন অংশের সাথে বিক্রিয়া করে কিউপ্রাস অক্সাইড-এ (Cu_2O) পরিণত হয়, যা লাল বর্ণের অধ :ক্ষেপ হিসেবে জমা হয়। রিডিউসিং স্যুগার পরীক্ষা করতে তাই এ অধঃক্ষেপ নেওয়া হয়।

শ্রেণিবিন্যাস (Classification) : মনোস্যাকারাইডকে বিজারণধর্মী অ্যালডিহাইড (-CHO) বা কিটোন (‹C = O) গ্রুপের উপস্থিতি অনুসারে এবং কার্বন সংখ্যার ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। যথা-

১। বিজারণধর্মী অংশের প্রকৃতির ভিত্তিতে : অ্যালডিহাইড বা কিটোন গ্রুপের উপস্থিতির ভিত্তিতে মনোস্যাকারাইডকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) অ্যালডোজ (Aldose) : অ্যালডিহাইড গ্রুপযুক্ত কার্বোহাইড্রেটকে অ্যালডোজ (aldose) বলে। যেমন- গ্লুকোজ, এরিথ্রোজ, রাইবোজ, গ্যালাকটোজ ইত্যাদি।

(খ) কিটোজ (Ketose) : কিটোন গ্রুপযুক্ত কার্বোহাইড্রেটকে কিটোজ (Ketose) বলে। যেমন- ফ্রুক্টোজ, রাইবুলোজ ইত্যাদি।

২। কার্বন সংখ্যার ভিত্তিতে : কার্বন পরমাণুর সংখ্যার উপস্থিতির ভিত্তিতে মনোস্যাকারাইডকে নিম্নলেখিতভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়-

(ক) ট্রায়োজ স্যুগার (Triose, $C_3H_6O_3$) : তিন কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে ট্রায়োজ স্যুগার বলে। যেমন- গ্লিসার।ালডিহাইড, ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ইত্যাদি। এরা উদ্ভিদে ফসফরিক এসিডের সাথে এস্টার গঠন করে শর্করা বিপাকে অংশ নেয়। গ্লিসার।ালডিহাইড-এর ১ নং কার্বনে একটি কার্বনাইল অক্সিজেন যুক্ত হয়ে অ্যালডিহাইড গ্রুপ নির্দেশ করে এবং ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোনের ২নং কার্বনে কার্বনাইল অক্সিজেন যুক্ত হয়ে কিটোন গ্রুপ নির্দেশ করে। কাজেই গ্লিসার।ালডিহাইড হলো একটি অ্যালডোজ (aldose) এবং ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন হলো একটি কিটোজ (ketose)। অ্যালডিহাইড এবং কিটোন গ্রুপকে বলা হয় রিডিউসিং গ্রুপ (reducing group) কারণ এরা সহজেই কতিপয় যৌগের সাথে জারিত (oxidation) হয়ে যায় এবং ঐ যৌগ বিজারিত (reducing) হয়। তাই অ্যালডিহাইড এবং কিটোন গ্রুপযুক্ত চিনিকে বলা হয় রিডিউসিং স্যুগার (reducing sugar) বা বিজারক শর্করা।

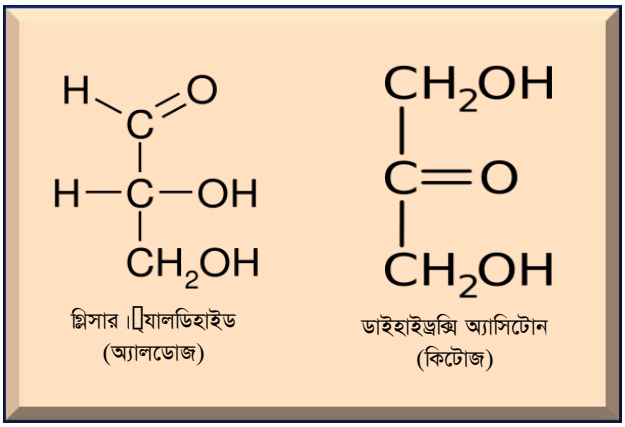

গ্লিসার।ালডিহাইড (অ্যালডোজ) | ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন (কিটোজ)

(খ) টেট্রোজ স্যুগার (tetrose, $C_4H_8O_4$) : চার কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে টেট্রোজ স্যুগার বলে। যেমন- এরিথ্রোজ ও এরিথ্রালোজ ইত্যাদি। চার কার্বন বিশিষ্ট অ্যালডিহাইড গ্রুপের মনোস্যাকারাইডকে অ্যালডোটেট্রোজ (aldotetrose) ও কিটোন গ্রুপের মনোস্যাকারাইডকে কিটোটেট্রোজ (ketotetrose) বলে। এরা উদ্ভিদে এরিথ্রোফসফেট হিসেবে বিদ্যমান থাকে। সালোকসংশ্লেষণের ক্যালভিন চক্রে এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

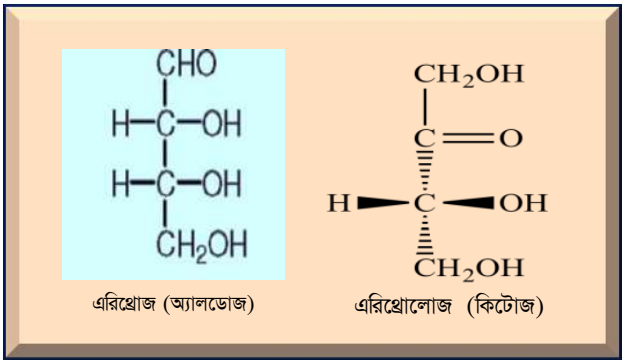

এরিথ্রোজ (অ্যালডোজ) | এরিথ্রোলোজ (কিটোজ)

(গ) পেন্টোজ স্যুগার (Pentose, $C_5H_{10}O_5$) : পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে পেন্টোজ স্যুগার বলে। জীবদেহের জৈবিক কার্যাবলীতে পেন্টোজ স্যুগার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরা নিউক্লিক এসিড গঠনে অংশগ্রহণ করে। কয়েক প্রকার পেন্টোজ স্যুগার কো-এনজাইম গঠনে অংশগ্রহণ করে। যেমন- ATP, NAD, CoA, NADP। এদের সাধারণ সংকেত $C_5H_{10}O_5$। জাইলোজ, রাইবোজ, ডিঅক্সিরাইবোজ, রাইবুলোজ ইত্যাদি হলে পেন্টোজ স্যুগারের উদাহরণ। নিচে কয়েকটি পেন্টোজ স্যুগারের বর্ণনা দেয়া হলো।

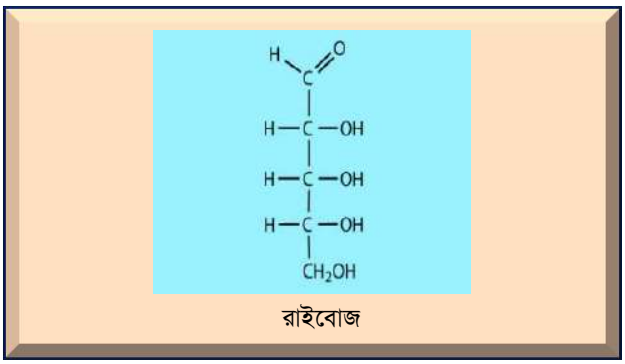

রাইবোজ

i. রাইবোজ (Ribose) : রাইবোজ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইড। এর আনবিক সংকেত $C_5H_{10}O_5$। বিজ্ঞানী Emil Fischer ১৮৯১ সালে এটি আবিষ্কার করেন। এর আণবিক গঠনে একটি অ্যালডিহাইড গ্রুপ (-CHO) থাকার কারণে একে অ্যালডোপেন্টোজও (aldopentose) বলে। এর গলনাঙ্ক ৯৫° সেলসিয়াস এবং এটি গাঢ় HCl এর সাথে বিক্রিয়া করে ফারফিউরাল এসিড উৎপন্ন করে।

জীবকোষে নিউক্লিক এসিড নামে এক ধরনের এসিড থাকে, যা দুধরনের। যথা- RNA (রাইবোনিউক্লিক এসিড) এবং DNA (ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড)। RNA সাধারণত দুটি পিউরিন ক্ষারক (অ্যাডিনিন ও গুয়ানিন), দুটি পাইরিমিডিন ক্ষারক (সাইটোসিন ও ইউরাসিল), একটি পেন্টোজ স্যুগার এবং ফসফেট গ্রুপ এর সমন্বয়ে গঠিত। একটি পিউরিন বা পাইরিমিডিন ক্ষারকের সাথে পেন্টোজ স্যুগার মিলে নিউক্লিওসাইড গঠন করে। এ নিউক্লিওসাইড অজৈব ফসফেটের সাথে যুক্ত হয়ে নিউক্লিওটাইড গঠন করে। অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড মিলে RNA গঠন করে। অর্থাৎ RNA হলো নিউক্লিওটাইডের পলিমার বা লম্বা চেইন। সুতরাং RNA গঠনের অপরিহার্য পেন্টোজ স্যুগারের নাম হলো রাইবোজ। কাজেই এটি একটি রাইবোনিউক্লিক এসিডের (RNA) গাঠনিক উপাদান।

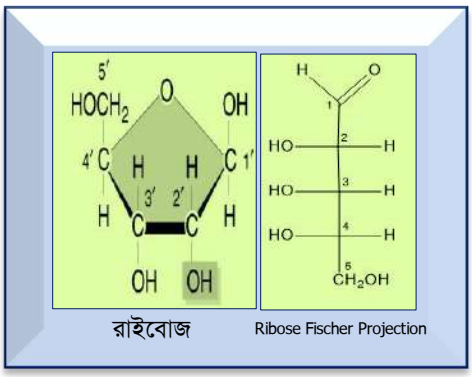

চিত্র : রাইবোজ অণুর গঠন

ii. ডিঅক্সিরাইবোজ (Deoxyribose) : এটিও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইড। এর আনবিক সংকেত $C_5H_{10}O_4$। বিজ্ঞানী Phoebus Levene ১৯২৯ সালে এটি আবিষ্কার করেন। এর আণবিক গঠনে একটি অ্যালডিহাইড গ্রুপ (-CHO) থাকার কারণে একে ডিঅক্সিঅ্যালডোপেন্টোজও (Deoxy aldopentose) বলে।

রাইবোজ ও ডিঅক্সিরাইবোজ দুটিই পেন্টোজ স্যুগার। কিন্তু এদের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো রাইবোজ স্যুগারের ২নং কার্বনে OH গ্রুপ থাকে আর ডিঅক্সিরাইবোজের ২নং কার্বনে OH গ্রুপ এর পরিবর্তে হাইড্রোজেন (H) পরমাণু থাকে। ডিঅক্সি অর্থ অক্সিজেন ছাড়া (without oxygen) অর্থাৎ ২নং কার্বনে অক্সিজেন থাকে না, হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে। এজন্য এ স্যুগারের নাম ডিঅক্সিরাইবোজ। রাইবোজ স্যুগারের মতো ডিঅক্সিরাইবোজও নিউক্লিওসাইড ও নিউক্লিওটাইড গঠন করে। পার্থক্য হলো নিউক্লিওসাইড গঠনের জন্য পাইরিমিডিন ক্ষারক সাইটোসিন ও থায়ামিন অংশগ্রহণ করে, কিন্তু ইউরাসিল অংশগ্রহণ করে না। অর্থাৎ RNA তে থায়ামিন অনুপস্থিত এবং DNA তে ইউরাসিল অনুপস্থিত। সুতরাং DNA গঠনের জন্য ডিঅক্সিরাইবোজ স্যুগার একটি অপরিহার্য উপাদান।

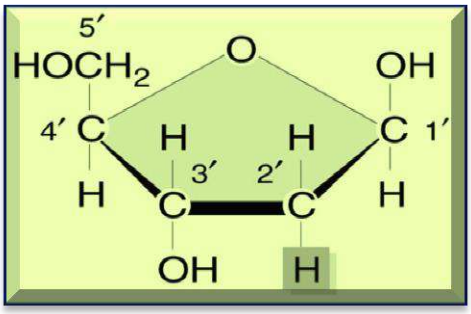
চিত্র : ডিঅক্সিরাইবোজ (চক্রিয় গঠন)

iii. রাইবুলোজ (Ribulose) : রাইবুলোজ হলো এক ধরনের পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইড। এর আণবিক গঠনে একটি কিটোগ্রুপ (›C = O) রয়েছে তাই একে কিটোপেন্টোজও বলে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় রাইবুলোজ হতে তৈরি হয় রাইবুলোজ ১, ৫-ডাইফসফেট। এটি সালোকসংশ্লেষণে CO_2 গ্রাহক হিসেবে কাজ করে। এটি পরে বিজারিত হয়ে একটি কার্বাক্সিল যৌগ গঠন করে যা সাথে সাথে ফসফোগ্লিসারিক এসিডের দুটি অণু প্রদান করে।

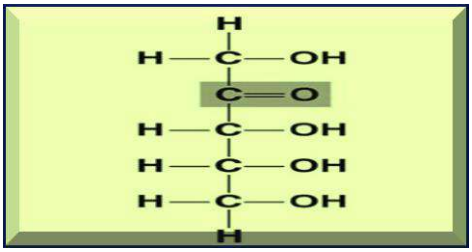
চিত্র : রাইবুলোজ অণুর গঠন

রাইবোজ ও ডিঅক্সিরাইবোজের মধ্যে পার্থক্য (The difference between ribose and deoxyribose) :

পার্থক্যের বিষয়	রাইবোজ (Ribose)	ডিঅক্সিরাইবোজ (Deoxyribose)
১। গাঠনিক উপাদান	এটি RNA-এর অপরিহার্য উপাদান।	এটি DNA-এর অপরিহার্য উপাদান।
২। এসিডের সাথে বিক্রিয়া	HCl এর সাথে বিক্রিয়া করে ফারফিউরাল এসিড তৈরি করে।	HCl এর সাথে বিক্রিয়া করে লেভুলিনিক এসিড তৈরি করে।
৩। অক্সিজেন পরমাণু	আণবিক গঠনে ৫টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে।	আণবিক গঠনে ৪টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে।
৪। OH গ্রুপ	২নং কার্বন পরমাণুতে -OH গ্রুপ থাকে।	২নং কার্বন পরমাণুতে -OH গ্রুপ থাকে না।
৫। আনবিক সংকেত	এর আণবিক সংকেত $C_5H_{10}O_5$।	এর আণবিক সংকেত $C_5H_{10}O_4$।
৬। গঠন	RNA নিউক্লিসাইড ও নিউক্লিওটাইডের গাঠনিক উপাদান।	DNA নিউক্লিসাইড ও নিউক্লিওটাইডের গাঠনিক উপাদান।
৭। প্রধান কাজ	নিউক্লিওটাইড ও শর্করা তৈরিতে অংশগ্রহণ করে।	ডিঅক্সিনিউক্লিওটাইড গঠনে অংশগ্রহণ করে।

(ঘ) হেক্সোজ স্যুগার (Hexose, $C_6H_{12}O_6$) : ৬ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় হেক্সোজ। এদের সাধারণ সংকেত $C_6H_{12}O_6$। গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ম্যানোজ, গ্যালাক্টোজ হলো প্রধান প্রধান হেক্সোজ। এরা উদ্ভিদকোষে মুক্ত অবস্থায় অথবা অন্য জঠিল কার্বোহাইড্রেট-এর অংশ হিসেবে বিরাজ করে। অ্যালডিহাইড গ্রুপের হেক্সোজকে অ্যালডোহেক্সোজ (aldohexose) ও কিটোন গ্রুপের হেক্সোজকে কিটোহেক্সোজ (ketohexose) বলে। সাধারণত গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজকে মুক্ত অবস্থায় সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। নিচে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

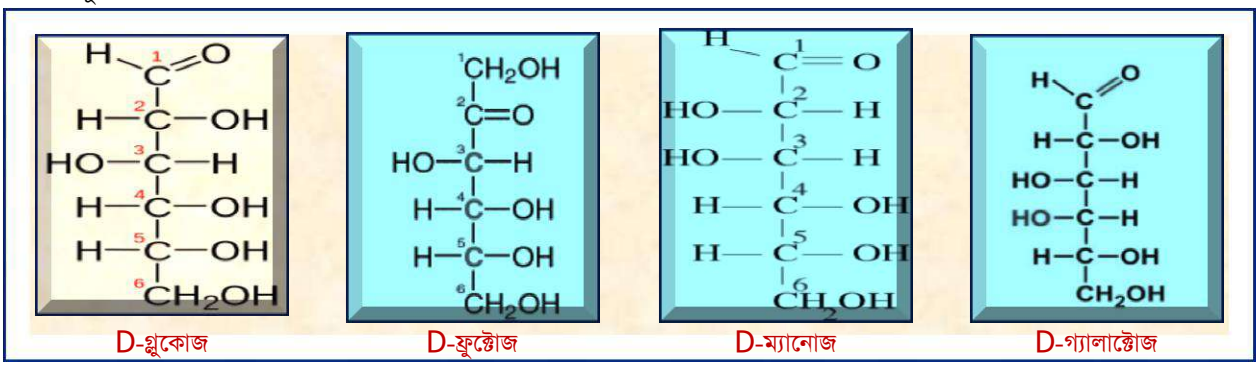

গ্লুকোজ (Glucose) : গ্লুকোজ এক প্রকার গুরুত্বপূর্ণ হেক্সোজ মনোস্যাকারাইড। গ্লুকোজের অপর নাম ডেক্সট্রোজ (dextrose) এবং রাসায়নিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। এদের গঠনে অ্যালডিহাইড -CHO থাকায় এদের অ্যালডোহেক্সোজ বলে। এটি একটি রিডিউসিং স্যুগার। এটি গ্রেপ স্যুগার (grape sugar), কর্ণ স্যুগার (corn sugar), রক্ত শর্করা (blood sugar), ডি-গ্লুকোজ (D-glucose) নামেও পরিচিত। শ্বেতসারের অম্ল বিশ্লেষণ (acid hydrolysis) দ্বারা এটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপন্ন হয়। প্রায় সকল মিষ্টি ফল ও মধুতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। পাকা আঙ্গুরে ২০-৩০% গ্লুকোজ থাকে। শ্বসনের প্রাথমিক পদার্থ হলো গ্লুকোজ। গ্লুকোজ পলিমাররূপে, এককভাবে বা অন্য কোনো মনোস্যাকারাইডের সাথে মিলিতভাবে ডাইস্যাকারাইড, অলিগোস্যাকারাইড বা পলিস্যাকারাইড গঠন করে। যেমন- স্টার্চ, সেলুলোজ, সুক্রোজ প্রভৃতি গ্লুকোজ দিয়ে তৈরি।

গ্লুকোজের উৎপাদন (Glucose production) : স্বভোজী উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ সংশ্লেষ করে। যা দ্রুত অন্য যৌগ তৈরিতে ব্যবহার হয়। তাই সঞ্চিত দ্রব্য হিসেবে থাকে না। আবার গবেষণাগারে স্টার্চ ও সেলুলোজ আর্দ্র বিশ্লেষণ করে গ্লুকোজ উৎপাদন করা হয়।

গ্লুকোজের বৈশিষ্ট্য (Properties of glucose) : গ্লুকোজ একটি রিডিউসিং স্যুগার। এটি সাদা দানাদার পদার্থ এবং স্বাদে মিষ্টি। এটি পানিতে দ্রবণীয়, অ্যালকোহলে সামান্য দ্রবণীয় কিন্তু ইথারে আর্দ্রবণীয়। এটি উদ্ভিদদেহে পলিমার গঠন করে স্টার্চরূপে সঞ্চিত থাকে, কোষপ্রাচীরের গাঠনিক উপাদান হিসেবে এবং জীবদেহে প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে গ্লাইকোপ্রোটিন গঠন করে। ফসফরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে এস্টার গঠন করে। গ্লুকোজের গলনাঙ্ক ১৪৬° সেলসিয়াস।

গ্লুকোজের ব্যবহার (Use of glucose) : i. দ্রুত শক্তি উৎপাদন ও সহজপাচ্য হওয়ায় রোগীর পথ্যরূপে গ্লুকোজের বহুল ব্যবহার প্রচলিত। ii. এটি ঔষধ শিল্পে ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। iii. ফল সংরক্ষণে গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়। iv. ভিটামিন সি এবং সরবিটল প্রস্তুত করার জন্য গ্লুকোজ ব্যবহার করা হয়। v. এটি কার্বোহাইড্রেট বিপাকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। vi. গ্লাইকোলাইসিসে গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়ে শক্তি উৎপন্ন হয়।

গ্লুকোজের রিং গঠন এবং α / β-D গ্লুকোজ (Ring structure of glucose and α / β-D-glucose) : গ্লুকোজের ১ নং কার্বন ও ৫ নং কার্বন কাছাকাছি এলে এদের মধ্যে একটি অক্সিজেন সেতু তৈরি হয়। এর ফলে ১নং কার্বনে ১টি OH গ্রুপ তৈরি হয়। নতুন করে সৃষ্ট এ OH গ্রুপটি ১নং কার্বনের আলফা (α) বা বিটা (β) স্থানে অবস্থান করতে পারে। α-গ্লুকোজের ক্ষেত্রে OH গ্রুপটি ডানদিকে বা নিচে থাকে এবং β গ্লুকোজের ক্ষেত্রে OH গ্রুপটি বাম দিকে বা উপরে থাকে। OH গ্রুপের এ α ও β অবস্থানের কারণে গ্লুকোজের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে। যেমন- α গ্লুকোজ গঠন করে স্টার্চ এবং β-গ্লুকোজ গঠন করে সেলুলোজ। সেলুলোজ কোষের গাঠনিক বস্তু কিন্তু স্টার্চ কোষের সঞ্চয়ী বস্তু।

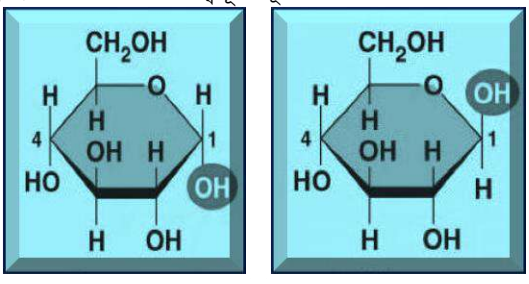

D এবং L গ্লুকোজ (s) : গ্লুকোজের শিকল গঠনের ৫ নং অপ্রতিসম কার্বনের সাথে যুক্ত OH গ্রুপের অবস্থান অনুযায়ী গ্লুকোজকে D গ্লুকোজ ও L গ্লুকোজ হিসেবে নামকরণ করা হয়। D অর্থ Dextrorotatory (clockwise turn) এবং L অর্থ Laevorotatory (anticlockwise turn)। গ্লুকোজের ৫নং কার্বনে সংযুক্ত OH গ্রুপটি যদি ডান দিকে (clockwise turn-এর দিকে) অবস্থান করে তখন তাকে D-গ্লুকোজ বলে। এটিকে d বা + চিহ্ন দিয়েও বোঝানো হয়ে থাকে। অন্যদিকে গ্লুকোজের ৫ নং কার্বনে সংযুক্ত OH গ্রুপটি যদি বাম দিকে (clockwise turn-এর বিপরিতদিকে) অবস্থান করে তখন তাকে L গ্লুকোজ বলে। এটিকে Y বা - চিহ্ন দিয়েও বোঝানো হয়ে থাকে। প্রকৃতির সকল গ্লুকোজই D-গ্লুকোজ প্রকৃতির।

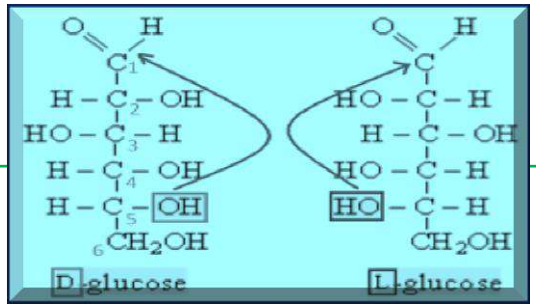

ফ্রুক্টোজ (Fructose) : ফ্রুক্টোজ হলো হেক্সোজ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ মনোস্যাকারাইড যার রাসায়নিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ রিডিউসিং স্যুগার (reducing sugar)। এর গঠনে কিটো গ্রুপ (‹C = O) থাকায় একে কিটোহেক্সোজ বলে। এর অন্য নাম লেভ্যুলোজ।

উদ্ভিদে ফ্রুক্টোজের পরিমাণ খুব বেশি। মিষ্টি ফলের রস, নেকটার এবং মধুতে অধিক পরিমাণে মুক্ত ফ্রুক্টোজ পাওয়া যায়। সেজন্য একে ফলের চিনি (fruit sugar) বলে। ফ্রুক্টোজ সমপরিমাণ গ্লুকোজের সাথে যুক্ত হয়ে চিনি গঠন করে। তাই একে আখ ও বীটের কাণ্ডরসে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। গ্লুকোজের মতো ফ্রুক্টোজও D ও L এই দুই ধরনের হয়ে থাকে। ফ্রুক্টোজের ৫ নং কার্বনের OH গ্রুপ ডানে থাকলে তাকে D-ফ্রুক্টোজ ও বামে থাকলে L-ফ্রুক্টোজ বলে। অপরদিকে ফ্রুক্টোজের ২ নং কার্বনের OH গ্রুপটি নিচে বা Þ অবস্থানে থাকলে Þ-ফ্রুক্টোজ ও উপরে বা β অবস্থানে থাকলে, তাকে β-ফ্রুক্টোজ বলে।

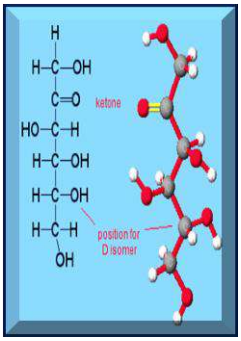

D-ফ্রুক্টোজ
(৫নং কার্বনের OH ডান দিকে)

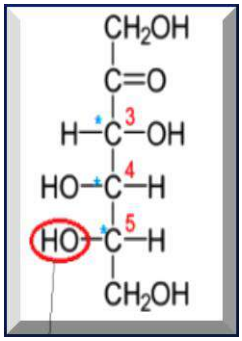
L-ফ্রুক্টোজ
(৫নং কার্বনের OH বাম দিকে)

ফ্রুক্টোজের উৎপাদন ও প্রস্তুত প্রণালী (Fructose production and preparation) : সবুজ উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ফ্রুক্টোজ তৈরি হয়। গ্লুকোজ থেকে সহজেই ফ্রুক্টোজ তৈরি হয়। আবার সুক্রোজকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে সমপরিমাণ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ তৈরি হয়।

ফ্রুক্টোজের বৈশিষ্ট্য (Properties of fructose) : ফ্রুক্টোজ সাদা দানাদার, স্ফটিকাকার ও মিষ্টি জাতীয় পদার্থ। পানিতে সহজেই দ্রবণীয়। গরম অ্যালকোহলেও দ্রবণীয়। গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের আণবিক সংকেত এক হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। তাই এদেরকে আইসোমার বলে।

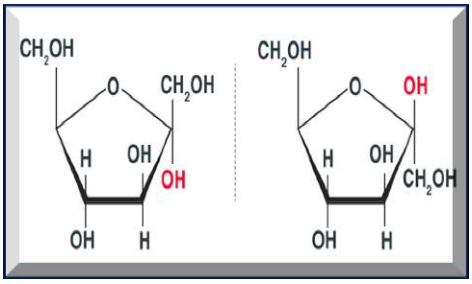
α-D-ফ্রুক্টোজ
(রিং স্ট্রাকচার)

β-D-ফ্রুক্টোজ
(রিং স্ট্রাকচার)

ফ্রুক্টোজের ব্যবহার (Use of fructose) :

১। কনফেকশনারিতে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করার জন্য ফ্রুক্টোজ ব্যবহার করা হয়।
২। ডায়াবেটিস রোগীর খাদ্যে ইক্ষু শর্করার বিকল্প হিসেবে ফ্রুক্টোজ ব্যবহৃত হয়।
৩। ফসফরিক এসিডের সাথে যুক্ত হয়ে এস্টার গঠনে শ্বসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ এর মধ্যে পার্থক্য (Difference between glucose and fructose) :

পার্থক্যের বিষয়	গ্লুকোজ (Glucose)	ফ্রুক্টোজ (Fructose)
১। ধরন	এটি একটি অ্যালডোহেক্সোজ, কারণ এতে অ্যালডিহাইড গ্রুপ (-CHO) আছে।	এটি একটি কিটোহেক্সোজ, কারণ এতে কিটো গ্রুপ (‹C = O) আছে।
২। বিশেষ নাম	একে গ্রেইপ স্যুগার বলা হয়।	একে ফ্রুট স্যুগার বলা হয়।
৩। সালোকসংশ্লেষণ	সালোকসংশ্লেষণে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়।	সালোকসংশ্লেষণে সরাসরি ফ্রুক্টোজ উৎপন্ন হয় না।
৪। শ্বসন	শ্বসনের প্রাথমিক পদার্থ হলো গ্লুকোজ।	শ্বসনে গ্লুকোজ হতে ফ্রুক্টোজ উৎপন্ন হয।
৫। গাঠনিক বলয়	এদের রিং স্ট্রাকচার পাইরানোজ ধরনের।	এদের রিং স্ট্রাকচার ফিউরানোজ ধরনের।
৬। বিশেষ কাজ	বিভিন্ন পলিস্যাকারাইড গঠন করে।	সুক্রোজ বা চিনি গঠন করে।
৭। মিষ্ঠতা	স্বাদে কম মিষ্ঠ।	স্বাদে বেশি মিষ্ঠ।
৮। প্রাপ্তিস্থান	মানব রক্তে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।	মানব রক্তে থাকে না।
৯। আবর্তন	এটি ডানাবর্ত শর্করা।	এটি বামাবর্ত শর্করা।

(ঙ) হেপ্টোজ স্যুগার (Heptose, $C_7H_{14}O_7$) : সাত কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে হেপ্টোজ স্যুগার বলে। যেমন- গ্লুকোহেপটোজ, সেডোহেপ্টোলোজ। প্রথমে *Sedum* sp. তে পাওয়া গিয়েছিল বলে এর নাম সেডোহেপ্টোলোজ। এটিকে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার C_3 চক্রের গুরুত্বপূর্ণ যৌগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এটি আবার পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে নামক বিপাকীয় পথে ফসফোরিক এসিডের সাথে এস্টার গঠন করে। অ্যালডিহাইড গ্রুপের হেপ্টোজ স্যুগারকে অ্যালডোহেপ্টোজ (aldoheptose) ও কিটোন গ্রুপের হেপ্টোজ স্যুগারকে কিটোহেপ্টোজ (ketoheptose) বলে।

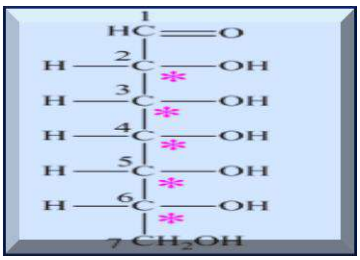
D-অ্যালডোহেপ্টোজ

ডাইস্যাকারাইড (Disaccharide; গ্রিক *di* = দুই এবং *saccharin* = স্যুগার) : যেসব অলিগোস্যাকারাইডকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে দুই অণু মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায়, তাদেরকে ডাইস্যাকারাইড বলে। যেমন- সুক্রোজ, মল্টোজ, ল্যাকটোজ ইত্যাদি। সুক্রোজকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু ফ্রুক্টোজ পাওয়া যায়। সুতরাং সুক্রোজ একটি ডাইস্যাকারাইড।

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{\text{আর্দ্র বিশ্লেষণ}} C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$$

দুই অণু মনোস্যাকারাইডের মধ্যে ঘনীভবন বিক্রিয়ার ফলে দুটো -OH মূলক থেকে এক অণু পানি অপসারিত হলে ডাইস্যাকারাইড উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন ডাইস্যাকারাইড অণুতে উভয় মনোস্যাকারাইডের C-O-C নতুন বন্ধন সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট বন্ধনকে (-O-) গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী (glycosidic bond) বলে।

নিচে তিনটি ডাইস্যাকারাইডের বর্ণনা দেয়া হলো-

১। সুক্রোজ (Sucrose) : উদ্ভিদে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডাইস্যাকারাইড হলো সুক্রোজ। এর আণকি সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$। এর সাধারণ নাম চিনি। সুক্রোজকে টেবিল স্যুগার (table sugar) বা কেইন স্যুগার (cane sugar) বা বীট স্যুগারও (beet sugar) বলা হয়ে থাকে। গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ রিডিউসিং স্যুগার হলেও সুক্রোজ কিন্তু নন-রিডিউসিং স্যুগার। এর কারণ হলো সুক্রোজ তৈরির সময় দুটি মনোস্যাকারাইডের অ্যালডিহাইড ও কিটোন গ্রুপের অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এর বিজারণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, সেজন্য এটিকে নন-রিডিউসিং স্যুগার বলে। সুক্রোজ তৈরির সময় α-D গ্লুকোজের ১নং কার্বনের OH এবং β-D ফ্রুক্টোজের ২নং কার্বনের OH এর মাঝে গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন তৈরি হয়। বন্ধনের ফলে এতে এক অণু পানি সৃষ্টি হয়ে বেরিয়ে যায় এবং এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু ফ্রুক্টোজ এক সাথে সংযুক্ত হয়ে গঠন করে এক অণু সুক্রোজ। গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ এর মিশ্রণকে বলা হয় ইনভার্ট স্যুগার (invert sugar)। সুক্রোজকে আর্দ্র বিশ্লেষণকারী এনজাইমকে বলা হয় ইনভারটেজ (invertase)। সবুজ উদ্ভিদের পাতায় প্রস্তুত কার্বোহাইড্রেট সুক্রোজ হিসেবে বিভিন্ন অঙ্গে পরিবাহিত হয়।

সুক্রোজের উৎপাদন প্রণালি (Sucrose Production Method) : ইক্ষু রসে প্রায় ১৫% সুক্রোজ, কিছু পরিমাণ জৈব এসিড, প্রোটিন ও ফসফেট জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান। সংগৃহীত রসকে পরিস্রুত করার পর তার সাথে কলিচুন মিশানো হয়। তার ফলে দ্রবণ থেকে এসিড প্রশমিত হয়, ফসফেট অধ :ক্ষিপ্ত হয় এবং চিনির আর্দ্র -বিশ্লেষণ বন্ধ হয়। অত :পর রসকে উত্তপ্ত করলে বেশির ভাগ ভেজাল ফেনা ও অধ :ক্ষেপ আকারে আলাদা হয়ে যায়। পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত পরিষ্কার রসকে নিম্নচাপে ঘণীভূত করলে সুক্রোজ এর স্ফটিক (চিনি) পাওয়া যায়।

সুক্রোজের বৈশিষ্ট্য (Properties of sucrose) : ১। সুক্রোজ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ নিয়ে গঠিত। ২। এটি সাদা দানাদার, মিষ্টি স্বাদযুক্ত কঠিন পদার্থ। ৩। স্বাদে গ্লুকোজ থেকে দ্বিগুণ মিষ্টি। ৪। পানিতে দ্রবণীয়, কিন্তু বিশুদ্ধ অ্যালকোহল ও ইথারে আর্দ্রবণীয়। ৫। এর গলনাঙ্ক ১৮৮° সেলসিয়াস। ৬। এটি বিজারক পদার্থ এবং এটিকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে সমপরিমাণ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ পাওয়া যায়।

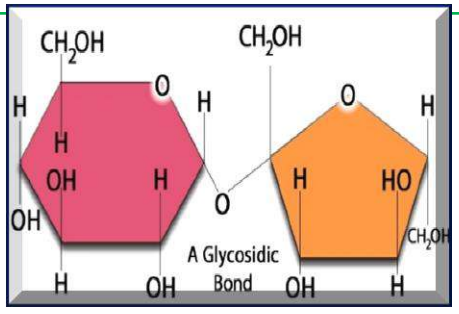

সুক্রোজের গঠন

সুক্রোজের ব্যবহার (Use of sucrose) : ১। সবুজ পাতায় সৃষ্ট সুক্রোজ উদ্ভিদের খাদ্য হিসেবে বিভিন্ন অঙ্গে পরিবাহিত হয়। ২। সুমিষ্ট খাদ্য তৈরিতে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ৩। পরীক্ষাগারে অক্সালিক এসিড প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত হয়। ৪। স্বচ্ছ সাবান তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ৫। শ্বসনের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে শক্তি উৎপাদন করে। ৬। পলিস্যাকারাইড সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়।

২। সেলোবায়োজ (Cellobiose) : দুই অণু β-D গ্লুকোজ β-১, ৪ লিংকেজ দিয়ে সংযুক্ত হয়ে এক অণু সেলোবায়োজ তৈরি করে। কাজেই সেলোবায়োজ একটি ডাইস্যাকারাইড। সাধারণত সেলুলোজ ও লিগনিন-এর আংশিক ভাঙ্গনের ফলে সেলোবায়োজ তৈরি হয়। দুটি সদৃশ গ্লুকোজ অণু যুক্ত হয়ে সেলোবায়োজ গঠিত হয়। এর আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$। এটি একটি রিডিউসিং স্যুগার।

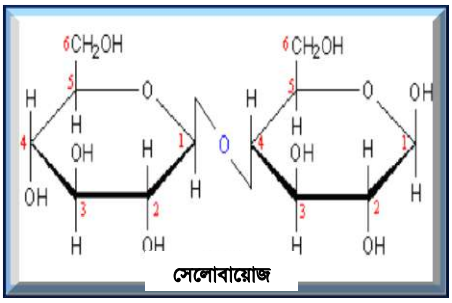

সেলোবায়োজ

উৎপাদন প্রক্রিয়া (Production process) : সেলুলোজকে আংশিকভাবে আর্দ্র-বিশ্লেষণ করলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক (unit) গঠিত হয় তাদের মধ্যে অন্যতম যৌগ হলো সেলোবায়োজ। ইমালসিন এনজাইম ও এসিডের প্রভাবে সেলোবায়োজ ভেঙ্গে দুই অণু গ্লুকোজে পরিণত হয়। আবার ব্রোমিন পানি দিয়ে সেলোবায়োজকে জারিত করলে সেলোবায়োনিক এসিড তৈরি হয়।

ব্যবহার (Use) : কোষ প্রাচীরের একটি গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

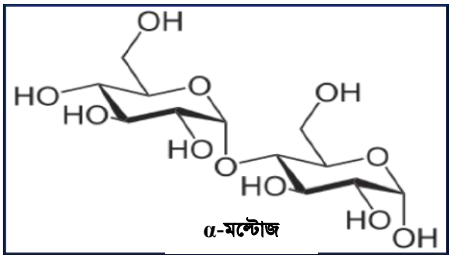
α-মল্টোজ

৩। মল্টোজ (Maltose) : এটিও এক ধরনের ডাইস্যাকারাইড। দুই অণু α-D গ্লুকোজ α-1, 4 লিংকেজ দিয়ে সংযুক্ত হয়ে এক অণু মল্টোজ গঠন করে। এটি আংশিক রিডিউসিং স্যুগার। এর আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$। সাধারণত স্টার্চের আংশিক ভাঙ্গনের ফলে মল্টোজ তৈরি হয়। এর আপেক্ষিক মিষ্টতা ৩২।

অলিগোস্যাকারাইড (Oligosaccharide) : যেসব কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে ২ থেকে ১০টি মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায়, তাদেরকে অলিগোস্যাকারাইড বলে। গ্রিক শব্দ oligo = কমসংখ্যেক এবং saccharum = চিনি। এই দুটি শব্দ থেকে অলিগোস্যাকারাইড শব্দটি গঠিত হয়েছে। যেমন- সুক্রোজ, মল্টোজ, ট্রিহালোজ, র।যাফিনোজ ইত্যাদি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অলিগোস্যাকারাইড। মনোস্যাকারাইডগুলো গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দিয়ে পরস্পর যুক্ত থেকে এক একটি অলিগোস্যাকারাইড গঠন করে। একটি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রক্সিল গ্রুপের সাথে অন্য একটি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রক্সিল গ্রুপ যে বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকে, তাকে গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন (glycosidic linkage) বলে। অলিগোস্যাকারাইডগুলোকে তাদের মধ্যে বিদ্যমান মনোস্যাকারাইডের সংখ্যা দিয়ে শ্রেণিবিভাগ করা হয়; যেমন- তিনটি মনোস্যাকারাইড থাকলে ট্রাইস্যাকারাইড বলে, চারটি থাকলে টেট্রাস্যাকারাইড, পাচটি থাকলে পেন্টাস্যাকারাইড ইত্যাদি।

প্রকারভেদ (Type) : মনোস্যাকারাইডের অণুর সংখ্যার ভিত্তিতে অলিগোস্যাকারাইডকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়-

১। ট্রাইস্যাকারাইড (Trisaccharide) : যেসব অলিগোস্যাকারাইডকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে তিন অণু মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায় তাদেরকে ট্রাইস্যাকারাইড বলে। যেমন- র‍্যাফিনোজ, র‍্যাবিনোজ, র‍্যামিনোজ, ম্যালিজিটোজ ইত্যাদি।

$$C_{18}H_{32}O_{16} + 2H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$$

র‍্যাফিনোজ + পানি $\xrightarrow{\text{আর্দ্র বিশ্লেষণ}}$ গ্যালাকটোজ + গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ

র‍্যাফিনোজকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে এক অণু গ্লুকোজ, এক অণু ফ্রুক্টোজ এবং এক অণু গ্যালাকটোজ পাওয়া যায়। সুতরাং র।যাফিনোজ একটি ট্রাইস্যাকারাইড।

২। টেট্রাস্যাকারাইড (Tetrasaccharide) : যেসব অলিগোস্যাকারাইডকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে চার অণু মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায় তাদেরকে টেট্রাস্যাকারাইড বলে। যেমন- স্ট্যাকায়োজ, স্কার্ডোজ ইত্যাদি।

$$C_{24}H_{42}O_{21} + 3H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$$

স্ট্যাকায়োজ + পানি $\xrightarrow{\text{আর্দ্র বিশ্লেষণ}}$ গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ + গ্যালাকটোজ + গ্যালাকটোজ

৩। পেন্টাস্যাকারাইড (Pentasaccharide) : যেসব অলিগোস্যাকারাইডকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে পাuচ অণু মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায় তাদেরকে পেন্টাস্যাকারাইড বলে। যেমন- ভার্বাকোজ।

$$C_{30}H_{52}O_{26} + 4H2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$$

ভার্বাকোজ + পানি $\xrightarrow{\text{আর্দ্র বিশ্লেষণ}}$ গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ + গ্যালাকটোজ + গ্যালাকটোজ + গ্যালাকটোজ

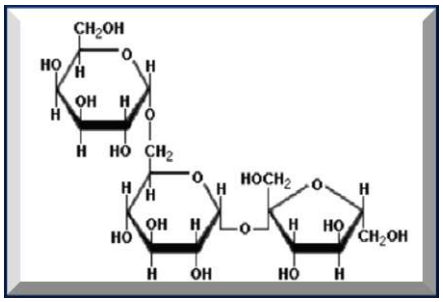

র।যাফিনোজ (ট্রাইস্যাকারাইড)

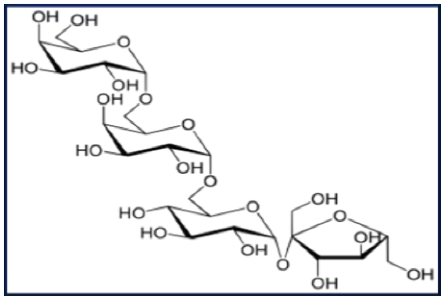

স্ট্যাকায়োজ (টেট্রাস্যাকারাইড)

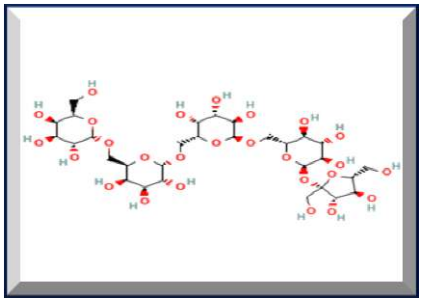

ভার্বাকোজ (পেন্টাস্যাকারাইড)

কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) : সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সূর্যালোকের উপস্থিতিতে H_2O ও CO_2 থেকে কার্বোহাইড্রেট তৈরি করে নিজ দেহকোষের অংশীভূত করে । প্রাণিরা উদ্ভিদের কাছ থেকে এটি গ্রহণ করে থাকে। জীবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ গাঠনিক ও সঞ্চয়ী উপাদান হলো কার্বোহাইড্রেট। এটি একটি জটিল জৈব যৌগ যা কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত। যৌগটিতে এ তিনটি মৌলের অনুপাত ১ : ২ : ১। কার্বোহাইড্রেটের সাধারণ সংকেত $C_n(H_2O)_n$; যেখানে n এর মান অভিন্ন বা ভিন্ন হতে পারে। যেমন- গ্লুকোজ- $C_6H_{12}O_6$ (n-এর মান অভিন্ন) এবং সুক্রোজ- $C_{12}H_{22}O_{11}$ (n- এর মান ভিন্ন)।

সংজ্ঞা : যে সকল অ্যালডিহাইড বা কিটোন জাতীয় যৌগে কতগুলো হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকে অথবা যারা আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে কতগুলো হাইড্রোক্সিল গ্রুপযুক্ত অ্যালডিহাইড বা কিটোন উৎপন্ন করে সেসব যৌগকে কার্বোহাইড্রেট বলে।

ফরাসি „হাইড্রেটস অব কার্বন, (hydrates of carbon) থেকে কার্বোহাইড্রেট নামকরণ হয়েছে। এর অর্থ দাড়ায় 'কার্বনের জলায়ন' অর্থাৎ এক অণু পানির সাথে এক অণু কার্বন (CH_2O) এই অনুপাতে গঠিত বিভিন্ন প্রকার যৌগ (diverse compounds based on the general formula CH_2O are carbohydrates) ।

এজন্য কার্বোহাইড্রেটগুলোকে পলিহাইড্রোঅক্সিঅ্যালডিহাইড (ployhydroxyaldehyde) অথবা পলিহাইড্রোঅক্সিকিটোন (polyhydroxyketone) বলাই যুক্তিযুক্ত। অধিকাংশ উদ্ভিদদেহের শুস্ক ওজনের ৫০-৮০% কার্বোহাইড্রেট থাকে। পৃথিবীর বুকে সকল জৈব বস্তুর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় যা জীবদেহে গাঠনিক উপাদান বা সঞ্চয়ী উপাদান হিসেবে থাকে।

কার্বোহাইড্রেটের (শর্করা) বৈশিষ্ট্য (Characteristics of carbohydrate) :

১। কার্বোহাইড্রেটসমুহ নির্দিষ্ট গঠন ও কাঠামো বিশিষ্ট হয়ে থাকে।
২। এরা জীবদেহে শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে এবং জারিত হয়ে শক্তি মুক্ত করে।
৩। এগুলো দানাদার, তন্তুময় বা স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ।
৪। এরা স্বাদে মিষ্টি বা স্বাদহীন হতে পারে। বিজারক (reducing) ও অবিজারক (non-reducing) হতে পারে।
৫। এদের অধিকাংশ পানিতে দ্রবণীয় তবে পলিস্যাকারাইডসমুহ আর্দ্রবণীয়।
৬। এরা অধিক তাপে অঙ্গার বা কয়লায় পরিণত হয়।
৭। এসিডের সাথে মিশে এস্টার গঠন করে।
৮। এরা আলোক সক্রিয় ও আলোক সমাণুতা প্রদর্শন করে।
৯। উদ্ভিদদেহ গঠনকারী মূল রাসায়নিক পদার্থ (৫০-৮০%) হিসেবে কাজ করে।
১০। বিভিন্ন প্রকার কো-এনজাইমের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।
১১। অণুজীব গাঁজন প্রক্রিয়ায় এদেরকে অ্যালকোহলে পরিণত করে।
১২। এরা সরল শৃঙ্খল কাঠামো ও বলয় বা রিং গঠন করতে পারে।
১৩। কতিপয় শর্করা আইসোমারিজম (isomerism) ধর্ম প্রদর্শন করে।
১৪। এদের আর্দ্র বিশ্লেষণে অনুরূপ ধর্ম বিশিষ্ট অ্যালডিহাইড ও কিটোন পাওয়া যায়।
১৫। কার্বোহাইড্রেটগুলোতে অবশ্যই হাইড্রোক্সিল ও কার্বোনিল গ্রুপ থাকে।

কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of carbohydrate) :

(ক) ভৌত ধর্ম বা স্বাদ-এর ভিত্তিতে : ভৌত ধর্ম বা স্বাদ-এর উপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১। স্যুগার (sugar), ২। নন-স্যুগার (non-sugar)।

১। স্যুগার (Sugar) : যে সকল কার্বোহাইড্রেট স্বাদে মিষ্ট, দানাদার, পানিতে দ্রবণীয় এবং আণবিক ওজন সঠিকভাবে জানা যায়, তাদেরকে স্যুগার বলে। যেমন- গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ ইত্যাদি।

২। নন-স্যুগার (Non-sugar) : যে সকল কার্বোহাইড্রেট স্বাদহীন, অদানাদার, পানিতে আর্দ্রবণীয় এবং আণবিক ওজন সঠিকভাবে জানা যায় না, তাদেরকে নন-স্যুগার বলে। যেমন- শ্বেতসার, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন ইত্যাদি।

(খ) রাসায়নিক ধর্ম বা বিজারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে : রাসায়নিক ধর্ম বা বিজারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেটকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১। রিডিউসিং বা বিজারক স্যুগার (reducing sugar) ও ২। নন-রিডিউসিং বা অবিজারক স্যুগার (non-reducing sugar)।

১। রিডিউসিং বা বিজারক স্যুগার (Reducing sugar) : যেসব কার্বোহাইড্রেটে মুক্ত অ্যালডিহাইড (-CHO) বা কিটোন (C = O) গ্রুপ থাকে এবং ক্ষারীয় আয়নকে বিজারিত করতে পারে, তাদেরকে রিডিউসিং বা বিজারক স্যুগার বলে। যেমন- গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ইত্যাদি। এরা ফেলিং বিকারক, বেনিডিক্ট বিকারক ইত্যাদির সাথে বিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম।

২। নন-রিডিউসিং বা অবিজারক স্যুগার (Non-reducing sugar) : যেসব কার্বোহাইড্রেটে মুক্ত অ্যালডিহাইড (-CHO) বা কিটোন (‹C = O) গ্রুপ থাকে না এবং ক্ষারীয় আয়নকে বিজারিত করতে পারে না, তাদেরকে নন-রিডিউসিং বা অবিজারক স্যুগার বলে। যেমন- সুক্রোজ, ট্রেহালোজ ইত্যাদি। এরা ফেলিং বিকারক, বেনিডিক্ট বিকারক ইত্যাদির সাথে বিক্রিয়া ঘটাতে অক্ষম।

পলিস্যাকারাইড (Polysaccharides) : যেসব কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে ১০ এর অধিক (কয়েকশত থেকে কয়েক হাজার) মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায়, তাদেরকে পলিস্যাকারাইড বলে। গ্রিক শব্দ poly = বহু এবং saccharum = চিনি এই দুটি শব্দ নিয়ে পলিস্যাকারাইড শব্দটি গঠিত। স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন, হেমিসেলুলোজ, পেকটিন, ইনুলিন, কাইটিন ইত্যাদি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পলিস্যাকারাইড। এদের আণবিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$, এগুলো জটিল ও উচ্চ আণবিক ওজন (high molecular weight) বিশিষ্ট জৈব রাসায়নিক পদার্থ। এগুলো গঠনগতভাবে সরল সূত্র অথবা শাখাযুক্ত সূত্রাকার। এরা সাধারণত পানিতে আর্দ্রবণীয় এবং স্বাদে মিষ্টি নয়। এরা কলয়েডধর্মী এবং সাধারণ তাপমাত্রায় পানিতে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় না। সেলুলোজ প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়, স্টার্চের পরিমাণ দ্বিতীয় পর্যায়ে।

শ্রেণিবিন্যাস (Classification) : পলিস্যাকারাইডগুলোকে উপাদানের প্রকৃতি, কাজ ও গঠনের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়ে থাকে।

(ক) উপাদানের নাম অনুসারে পলিস্যাকারাইড তিন প্রকার। যথা-

১। গ্লুকোসান (Glucosan) : গ্লুকোজ-জাতীয় শর্করা দ্বারা গঠিত বহুশর্করাকে গ্লুকোসান বলে। যেমন- গ্লাইকোজেন।

২। ফ্রুক্টোসান (Fructosan) : ফ্রুক্টোজ-জাতীয় শর্করা দ্বারা গঠিত বহুশর্করাকে ফ্রুক্টোসান বলে। যেমন- ২, ৬-অ্যানহাইড্রোফ্রুক্টোফিউরোনোজ ।

৩। গ্যালাকটোসান (Galactosan) : গ্যালাকটোজ-জাতীয় শর্করা দ্বারা গঠিত বহুশর্করাকে গ্যালাকটোসান বলে। যেমন- D-গ্যালাকটোসান ।

(খ) কাজ অনুসারে পলিস্যাকারাইড প্রধানত তিন ধরনের-

১। গাঠনিক পলিস্যাকারাইড (Structural Polysaccharide) : এরা জীবদেহের গঠন বা কাঠামো নির্মাণের সাথে জড়িত। যেমন- সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, পেকটিন প্রভৃতি উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর গঠন করে।

২। সঞ্চয়ী পলিস্যাকারাইড (Storage Polysaccharide) : এরা জীবদেহে সঞ্চিত বস্তু হিসেবে থাকে, যা পরে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যয় হয়। যেমন- স্টার্চ, গ্লাইকোজেন প্রভৃতি শ্বসন কাজে ব্যবহার হয়।

৩। জটিল পলিস্যাকারাইড (Complex Polysaccharide) : যে সকল কার্বোহাইড্রেট পলিস্যাকারাইড ও অশর্করার সমন্বয়ে গঠিত এবং কোষ নি :সৃত একপ্রকার জেলি-জাতীয় পদার্থ যা বহি :কোষীয় ধাত্রে দেখা যায় তাদেরকে জটিল পলিস্যাকারাইড বলে। যেমন- মিউকোপলিস্যাকারাইড (প্রোটিন, গ্যালাকটোজ, ম্যানোজের সমন্বয়ে গঠিত)- এটি একটি মিউকাস-জাতীয় পদার্থ, যা ঢেঁড়শ, ইসবগুল ইত্যাদিতে দেখা যায়।

(গ) উপাদানের প্রকৃতি অনুসারে : উপাদানের প্রকৃতি অনুসারে পলিস্যাকারাইড দুই প্রকার। যথা-

১। পেন্টোসান (Pentosan) : পেন্টোজ-জাতীয় একশর্করা দ্বারা গঠিত বহুশর্করাকে পেন্টোসান বলে। যেমন- জাইল্যান।

২। হেক্সোসান (Hexosan) : হেক্সোজ-জাতীয় একশর্করা দ্বারা গঠিত বহুশর্করাকে হেক্সোসান বলে। যেমন- গ্যালাক্ট্যান।

(ঘ) রাসায়নিক গঠনের ভিত্তিতে : রাসায়নিক গঠন বা মনোস্যাকারাইডের উপর ভিত্তি করে পলিস্যাকারাইডকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। হোমোপলিস্যাকারাইড (Homopolysaccharide) : একই ধরনের বহু মনোস্যাকারাইড দিয়ে যখন কোনো পলিস্যাকারাইড গঠিত হয়, তখন তাকে হোমোপলিস্যাকারাইড বলে। যেমন- স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন শুধুমাত্র গ্লুকোজ দিয়ে তৈরি।

২। হেটারোপলিস্যাকারাইড (Heteropolysaccharide) : দুই বা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মনোস্যাকারাইড দিয়ে যখন কোনো পলিস্যাকারাইড গঠিত হয়, তখন তাকে হেটারোপলিস্যাকারাইড বলে। যেমন- পেকটিন, হেমিসেলুলোজ ইত্যাদি।

মনোস্যাকারাইড ও পলিস্যাকারাইডের মধ্যে পার্থক্য
(Difference between monosaccharide and polysaccharide) :

পার্থক্যের বিষয়	মনোস্যাকারাইড (Monosaccharide)	পলিস্যাকারাইড (Polysaccharide)
১। একক	একটি মাত্র মনোস্যাকারাইড অণু দিয়ে গঠিত।	অনেকগুলো মনোস্যাকারাইডের একক দিয়ে গঠিত।
২। আর্দ্র বিশ্লেষণ	আর কোনো ক্ষুদ্র এককে ভাঙ্গা যায় না।	অনেকগুলো মনোস্যাকারাইডের এককে ভাঙ্গা যায়।
৩। বৈশিষ্ট্য	এরা স্বাদে মিষ্ট, দানাদার ও পানিতে দ্রবণীয়।	এরা স্বাদে মিষ্ট নয়, অদানাদার ও পানিতে আর্দ্রবণীয়।
৪। প্রকারভেদ	ট্রায়োজ, টেট্রোজ, পেন্টোজ ইত্যাদি।	হোমো, হেটারোপলিস্যাকারাইড ইত্যাদি।
৫। ধরণ	এরা সবচাইতে সরল কার্বোহাইড্রেট।	এরা জটিল গঠন বিশিষ্ট কার্বোহাইড্রেট।
৬। পরিপাক	শোষণের পূর্বে পরিপাকের প্রয়োজন হয় না।	শোষণের পূর্বে পরিপাকের প্রয়োজন হয়।
৭। উদাহরণ	গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, গ্যালাকটোজ।	স্টার্চ, গ্লাইকোজেন, সেলুলোজ।

স্টার্চ (Starch) : স্টার্চ হলো উদ্ভিদজগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ জটিল হোমোপলিস্যাকারাইড। যার রাসায়নিক সংকেত হলো $(C_6H_{10}O_5)_n$। সালোকসংশ্লেষণে সৃষ্ট গ্লুকোজ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন উপায়ে স্থায়ী দানাদার, সঞ্চিত পদার্থরূপে স্টার্চ জমা করে। স্টার্চের দানা (উদ্ভিদকোষে) অণুবীক্ষণযন্ত্রে দেখা যায় এবং এদের দানার আকার ও আকৃতি বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন রকমের। বীজ, ফল, কন্দ (tuber) প্রভৃতি সঞ্চয়ী অঙ্গে স্টার্চ জমা থাকে। স্টার্চ অ্যামাইলেজ থাকার কারণে এর দ্রবণে আয়োডিন যোগ করলে কালোবর্ণ বা কালো-নীল বর্ণ ধারণ করে। কিন্তু অ্যামাইলোপেকটিনের সাথে আয়োডিন বিক্রিয়া করে লাল বা পার্পল রং প্রদান করে। মানুষের প্রধান খাদ্য উপাদান হলো স্টার্চ যা ধান, গম,আলু, ভুট্টা, যবে পাওয়া যায়।

স্টার্চের গঠন (Structure of starch) : প্রকৃতিতে স্টার্চ অ্যামাইলেজ (১৫-২০%) এবং অ্যামাইলোপেকটিন (৮০-৮৫%) নামক দুটি পলিস্যাকারাইডের সমন্বয়ে গঠিত। উভয়ই গ্লুকোজের পলিমার এবং দীর্ঘ চেইনযুক্ত। অ্যামাইলেজ শাখাহীন হলেও অ্যামাইলোপেকটিন শাখাযুক্ত। অ্যামাইলেজ সাধারণত ২০০-১০০০ এবং অ্যামাইলোপেকটিনে ২০০০-২০০০০০ গ্লুকোজ অণু থাকে। অ্যামাইলোজের গ্লুকোজ অণুগুলো পরস্পর β-১, ৪ গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনে সংযুক্ত হয়ে সরল ও সোজা শিকল বা অশাখ গঠন সৃষ্টি করে। অন্যদিকে অ্যামাইলোপেকটিনের গ্লুকোজ অণুগুলো β-১, ৪ ও β-১, ৬ গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনে সংযুক্ত হয়ে শাখান্বিত শিকল গঠন করে। গ্লুকোজ একক দ্বারা তৈরি হলেও স্টার্চের স্বাদ বা গন্ধ নেই, দেখতে ধবধবে সাদা। একে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে প্রথমে ডেক্সট্রিন, এরপর মল্টোজ এবং পরে গ্লুকোজ আকারে মুক্ত হয়। স্টার্চের দীর্ঘ অণু বিভিন্ন আকৃতি ও আয়তনের স্থায়ী কণিকা গঠন করে থাকে। স্টার্চ আণুবীক্ষণিক এবং প্রজাতি বিশেষে কণিকার গঠনে পার্থক্য থাকে। যেমন- গোল আলুর স্টার্চ কণিকা বৃহত্তম আর চালের স্টার্চ কণিকা ক্ষুদ্রতম।

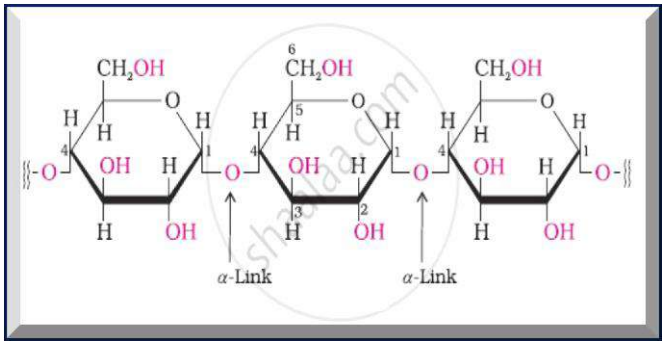

চিত্র : অ্যামাইলেজ এর গঠণ

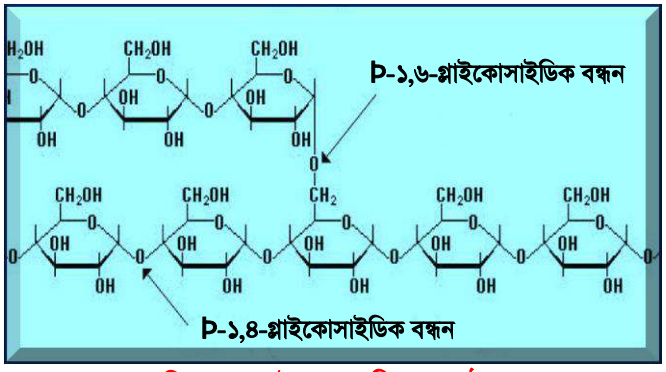

চিত্র : অ্যামাইলোপেকটিন এর গঠণ

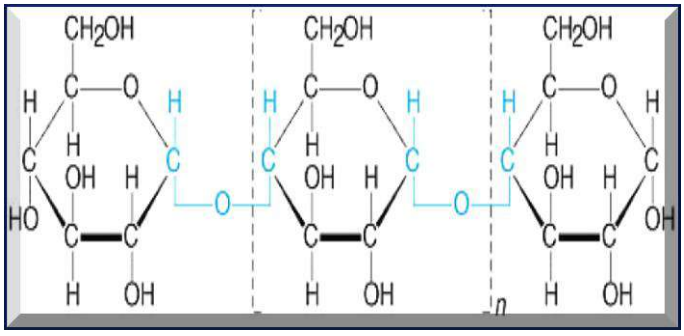
চিত্র : স্টার্চ এর গঠণ

স্টার্চের বৈশিষ্ট্য (Properties of starch) : ১। স্টার্চ গন্ধহীন, স্বাদহীন বর্ণহীন এবং সাদা পাউডার জাতীয় জৈব-রাসায়নিক পদার্থ। ২। সাধারণ তাপমাত্রায় এরা পানিতে, ইথার ও অ্যালকোহলে আর্দ্রবণীয়। ৩। আয়োডিন দ্রবণে স্টার্চ নীল বর্ণ ধারণ করে। ৪। উচ্চ তাপমাত্রায় স্টার্চ ভেঙ্গে ডেক্সট্রিন, পরে মল্টোজ এবং শেষে গ্লুকোজে পরিণত হয়। ৫। ফেলিং দ্রবণ স্টার্চ কর্তৃক বিজারিত হয় না।

স্টার্চের কাজ (Starch work) : স্টার্চ উদ্ভিদদেহে প্রধানত সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে থাকে। এটি প্রাণিরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে যা শক্তির অন্যতম উৎস।

স্টার্চের ব্যবহার (Use of starch) :

১। স্টার্চ স্বভোজী উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্য এবং প্রাণিকূলের প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২। এটি শ্বসনের প্রধান বস্তু, এ থেকে প্রচুর শক্তি ও তাপ পাওয়া যায়।

৩। এটি পরীক্ষাগারে গ্লুকোজ ও অ্যালহোহল তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

৪। বিভিন্ন কাগজ শিল্পে এবং আঠা প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৫। টাইট্রেশন করার সময় নির্দেশক হিসেবে স্টার্চ ব্যবহার করা হয়।

৬। কাপড়ে মাড় দেয়ার কাজে প্রচুর পরিমাণে স্টার্চ ব্যবহৃত হয়।

৭। ট্যালকম পাউডার ও অন্যান্য প্রসাধন তৈরিতে কর্ণ স্টার্চ ব্যবহার করা হয়।

৮। পরিবেশ বান্ধব বায়োপ্লাস্টিক ও অন্যান্য সিনথেটিক পলিমার উৎপাদনের জন্য স্টার্চ ব্যবহৃত হয়।

সেলুলোজ (Cellulose) : সেলুলোজ উদ্ভিদজগতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জটিল গাঠনিক হোমোপলিস্যাকারাইড। কারণ স্বভোজী প্রতিটি উদ্ভিদের কোষের কোষপ্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে তৈরি তাই উদ্ভিদের অবকাঠামো নির্মাণে ইহা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্ভিদদেহে যেহেতু কোন কঙ্কাল নেই, সেহেতু উদ্ভিদের ভার বহনের দায়িত্ব পালন করে সেলুলোজ। এটি জীবজগতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বিদ্যমান জৈব যৌগ। তুলায় সেলুলোজের পরিমাণ ৯৪%, লিনেনে ৯০% এবং কাঠে ৬০%। তূর্ণলতায় ৩০-৪০% আর জৈব বস্তু সমৃদ্ধ মাটিতে ৪০-৭০%।

সেলুলোজের গঠন (Structure of cellulose) : প্রায় ১২৫০-১২৫০০ Þ ও β গ্লুকোজ অণু চেইন আকারে একত্রিত হয়ে সেলুলোজ অণু গঠন করে। এর রাসায়নিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। এখানে β-D গ্লুকোজ অণু পরস্পর β-১-৪ কার্বন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সেলুলোজ অণু গঠন করে। সেলুলোজের সাথে অন্যান্য যেসব জৈব রাসায়নিক পদার্থ থাকে তা হলো লিগনিন, পেকটিন, সুবেরিন ইত্যাদি। সেলুলোজ ঘন H_2SO_4 বা HCl বা NaOH দ্বারা হাইড্রোলাইসিস করে গ্লুকোজে পরিণত করা যায়। এর আণবিক ওজন ২ লক্ষ থেকে কয়েক লক্ষ হয়ে থাকে।

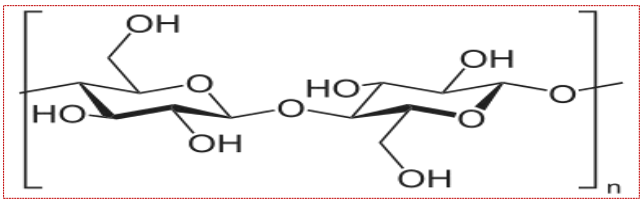

চিত্র : সেলুলোজের গঠন

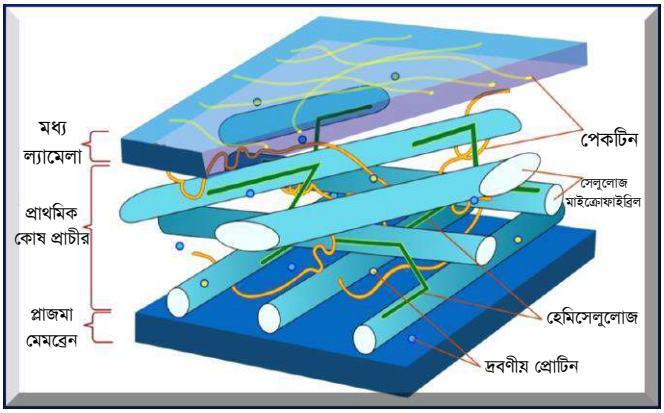

চিত্র : উদ্ভিদ কোষ প্রাচীরে সেলুলোজ এবং অন্যান্য পলিস্যাকারাইড-এর অবস্থান

সেলুলোজের বৈশিষ্ট্য (Properties of cellulose) : ১। সেলুলোজ উদ্ভিদকোষের অন্যতম গাঠনিক উপাদান। ২। এটি স্বাদহীন, গন্ধহীন সাদা ও কঠিন জৈব-রাসায়নিক পদার্থ। ৩। মিষ্টি বিবর্জিত এবং বিজারণ ক্ষমতাহীন। ৪। এটি পানি ও জৈব দ্রবণে আর্দ্রবণীয় এবং আয়োডিন দ্রবণ প্রয়োগে কোন রং দেয় না। ৫। এটি শক্ত ও ফাইবারের মতো এবং এর কোন পুষ্টিগুণ নেই। ৬। এরা সাধারণত রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় তবে গাঢ় এসিডে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়।

সেলুলোজের কাজ (The work of cellulose) : সেলুলোজ উদ্ভিদের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। বিশেষ করে এটি স্বভোজী উদ্ভিদের কোষের কোষপ্রাচীরের প্রধান উপাদান। এটি উদ্ভিদদেহকে দৃঢ়তা ও সুরক্ষা প্রদাণ করে।

সেলুলোজের ব্যবহার (Use of cellulose) : নিম্নে সেলুলোজের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১। সেলুলোজ দিয়ে তন্তু তৈরি হয়, যা বস্ত্রশিল্পের প্রধান কাঁচামাল।
২। এটি নাইট্রেট বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৩। এটি অ্যাসিটেট ফটোগ্রাফিক ফিল্মে ব্যবহার করা হয়। ফিল্টার পেপার, টিস্যু পেপার, ফটোগ্রাফিক ফিল্ম, প্যাকেজিং এর দ্রব্যসমুহ সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হয়।
৪। নির্মাণ সামগ্রী ও আসবাবপত্র তৈরিতে সেলুলোজ প্রধান উপাদান হিসেবে যান্ত্রিক সাহায্য প্রদান করে থাকে।
৫। থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফিতে স্টেশনারি ফেজ হিসেবে সেলুলোজ ব্যবহৃত হয়।
৬। গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৭। ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া হতে উৎপাদিত সেলুলোজ বর্তমানে বায়োটেকনোলজিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

স্টার্চ ও সেলুলোজের মধ্যে পার্থক্য (Differences between starch and cellulose) :

পার্থক্যের বিষয়	স্টার্চ (Starch)	সেলুলোজ (Cellulose)
১। গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন	স্টার্চ অণুতে প্রায় ১২০০-৬০০০ গ্লুকোজ একক Þ-গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে।	সেলুলোজ অণুতে প্রায় ৩০০-৩০০০ গ্লুকোজ একক β-গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে।
২। পলিমার	এটি হলো Þ-D গ্লুকোজ পলিমার।	এটি হলো β-D গ্লুকোজ পলিমার।
৩। পলিমার গঠন	স্টার্চ অণু শাখান্বিত গ্লুকোজ পলিমার।	ইহা অশাখান্বিত অর্থাৎ সরল শিকল পলিমার।
৪। প্রকৃতি	উদ্ভিদদেহে এটি সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে থাকে।	উদ্ভিদদেহে এটি গাঠণিক উপাদান হিসেবে থাকে।
৫। বর্ণ	আয়োডিনের সাথে বিক্রিয়া করে নীল বর্ণ প্রদান করে।	আয়োডিনের সাথে বিক্রিয়া করে কোনো বর্ণ প্রদান করে না।
৬। পরিপাক	এটি গরু-ছাগল ও মানুষ পরিপাক করতে পারে।	এটি গরু-ছাগল পরিপাক করতে পারলেও মানুষ পারে না।

গ্লাইকোজেন (Glycogen) : স্টার্চ ও সেলুলোজের ন্যায় গ্লাইকোজেনও একটি পুষ্টিজাত হোমোপলিস্যাকারাইড। এর রাসায়নিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। সবুজ উদ্ভিদে গ্লাইকোজেন সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত থাকলেও সায়ানোব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকে সঞ্চিত খাদ্যরূপে গ্লাইকোজেন উপস্থিত থাকে। গ্লাইকোজেন প্রাণিদের প্রধান সঞ্চিত খাদ্য হওয়াতে একে প্রাণিজ স্টার্চও (animal starch) বলে।

গ্লাইকোজেনের গঠন (Structure of glycogen) : গ্লাইকোজেনের আণবিক গঠন বহুলাংশে অ্যামাইলোপেকটিনের মতো। এর মূল গাঠনিক একক হলো Þ-D গ্লুকোজ। এর Þ-D গ্লুকোজ অণুগুলো Þ-১, ৪ ও Þ-১, ৬-গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গ্লাইকোজেন গঠন করে। এর অণু শৃঙ্খল অনেক বেশি শাখান্বিত, লম্বায় খাটো এবং প্রতিটি শাখায় ১০-২০টি গ্লুকোজ অণু থাকে। গ্লাইকোজেন Þ-১, ৬ গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনের মাধ্যমে এর শাখান্বিত গঠন সৃষ্টি করে।

গ্লাইকোজেনের বৈশিষ্ট্য (Properties of glycogen) : ১। গ্লাইকোজেন প্রাণিদেহের অন্যতম সঞ্চিত পদার্থ। ২। এটি সাদা পাউডার জাতীয় জৈব-রাসায়নিক পদার্থ। ৩। এটি ঠান্ডা পানিতে দ্রবণীয় এবং কলয়েড সাসপেনসন গঠন করে। ৪। এর আণবিক ওজন প্রায় ৫০ লাখ। ৫। এটি আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে মল্টোজ এবং পূর্ণ আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে Þ-গ্লুকোজ অণু প্রদান করে। ৬। এটি সাধারণ তাপমাত্রায় আয়োডিনের সাথে লালচে বেগুনি বর্ণ ধারন করে। তাপ দিলে এর লালচে বর্ণ চলে যায় এবং ঠান্ডা অবস্থায় কালো বর্ণ ফিরে আসে।

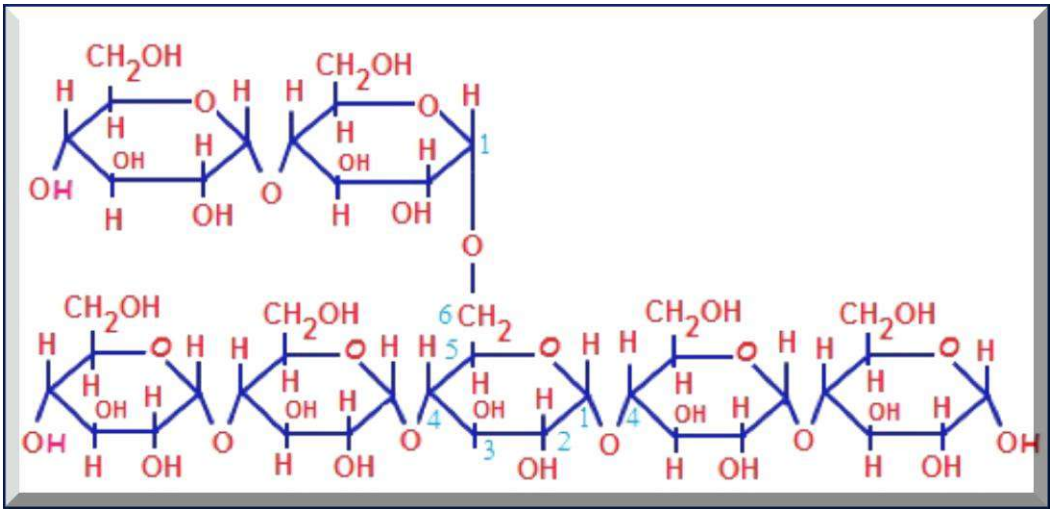

চিত্র : গ্লাইকোজেন অণুর একাংশ

গ্লাইকোজেনের কাজ (The function of glycogen) : ১। সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে কাজ করে। ২। যকৃতের গ্লাইকোজেন বিভক্ত হয়ে গ্লুকোজরূপে রক্তে প্রবাহিত হয় এবং রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ৩। পেশির গ্লাইকোজেন পেশির সংকোচন ও প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে। ৪। রক্তের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

গ্লাইকোজেনের ব্যবহার (Use of glycogen) : ১। পেশিতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন পেশির কাজে শক্তি যোগায়। ২। যকৃতের গ্রাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজে পরিণত হয়ে রক্তে প্রবাহিত হয়। ৩। এরা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

স্টার্চ ও গ্লাইকোজেনের মধ্যে পার্থক্য (Difference between starch and glycogen) :

পার্থক্যের বিষয়	স্টার্চ (Starch)	গ্লাইকোজেন (Glycogen)
১। অবস্থান	ধান, গম, আলু ইত্যাদিতে সঞ্চিত থাকে।	প্রাণির যকৃত ও পেশিতে পাওয়া যায়।
২। গঠন	স্টার্চের দুটি অংশ থাকে, যথা- অ্যামাইলেজ ও অ্যামাইলোপেকটিন।	গ্লাইকোজেনের কোনো প্রকারভেদ নেই।
৩। দ্রবণীয়তা	গরম পানিতে দ্রবণীয়।	ঠান্ডা পানিতে দ্রবণীয়।
৪। ধর্ম	আয়োডিনের সাথে নীল বর্ণ ধারণ করে।	আয়োডিনের সাথে লালচে বাদামি বর্ণ ধারণ করে।
৫। শাখা-প্রশাখা	স্বল্প শাখা-প্রশাখাযুক্ত।	অধিক শাখা-প্রশাখাযুক্ত।

জীবদেহে কার্বোহাইড্রেটের ভূমিকা (Role of Carbohydrate in Living Organisms) :

১। জীবদেহে শক্তির প্রধান উৎস হলো কার্বোহাইড্রেট। কোষীয় জারণে শর্করা জারিত হয়ে যে শক্তি মুক্ত হয় তা বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে ব্যবহৃত হয়।

২। মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণে কার্বোহাইড্রেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৩। অনেক শিল্পের কাঁচামাল হিসেবেও কার্বোহাইড্রেট ব্যবহৃত হয়।

৪। উদ্ভিদদেহের গাঠনিক উপাদান (শুকনো ওজনের ৫০-৮০%) হিসেবে উপস্থিত থাকে।

৫। এগুলো DNA, RNA, এনজাইম, কো-এনজাইম (ATP, FAD, NAD) গঠনে সাহায্য করে।

৬। প্রাণি, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া গ্লাইকোজেন নামক কার্বোহাইড্রেট সঞ্চয় করে।

৭। সেলুলোজ নামক কার্বোহাইড্রেট উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর গঠনে প্রধান ভূমিকা রাখে এবং উদ্ভিদকে দৃঢ়তা ও সুরক্ষা প্রদান করে।

৮। এগুলো অ্যামিনো এসিড ও ফ্যাটি এসিড বিপাকে সহায়তা করে এবং শক্তির উৎস হিসেবে প্রোটিন ভাঙ্গনকে রোধ করে।

৯। প্রাণিদেহে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কার্বাহাইড্রেট গ্লাইকোজেন হিসেবে যকৃত ও পেশিতে সঞ্চিত থাকে।

১০। এরা অস্থিসন্ধিস্থলে লুব্রিকেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়, গ্লাইকোপ্রোটিন সৃষ্টি করে থাকে।

১১। এরা প্রাণির রোগ প্রতিরোধ, নিষেক, রক্ত জমাট, বাধা প্রতিরোধ ও পরিস্ফুটনে ভূমিকা রাখে।

১২। কার্বোহাইড্রেট মস্তিস্ককে চিন্তা করা, কোন কাজের পদক্ষেপ নেওয়া এবং কাজ করার শক্তি যোগায়।

১৩। সেলুলোজ জাতীয় কার্বোহাইড্রেট মল হিসেবে বহিষ্কৃত হয় যা জীবন প্রণালীর জন্য অত্যাবশ্যক।

১৪। প্রাণিদেহে স্তনগ্রন্থি কোষে শর্করা গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ থেকে ল্যাক্টোজ ও দুগ্ধ শর্করা সংশ্লেষিত করে।

১৫। আমাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম বাহন কাগজ তৈরি হয় কার্বোহাইড্রেট থেকে।

১৬। অনেক হরমোন যেমন FSH (Follicle Stimulating Hormone) ও LH (Leutinizing Hormone) গ্লাইকোপ্রোটিন নির্মিত যারা প্রাণির প্রজনন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৭। এরা উদ্ভিদের সাপোর্টিং টিস্যুর গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে ও উদ্ভিদদেহ গঠনকারী পদার্থগুলোর কার্বন কাটামো (carbon skeleton) প্রদান করে।

১৮। মানুষের কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের শক্তির উৎস হিসেবে ও স্তন্যপায়ী প্রাণিদের gastro-intestinal কাজে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রক্তের বিভিন্ন অ্যান্টিজেনগুলো শর্করা থেকে উৎপন্ন হয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্দি করে থাকে।

কার্বোহাইড্রেটের পুষ্টিগত গুরুত্ব (Nutritional significance of carbohydrate) :

১। দেহগঠন (Body building) : দৈনিক খাদ্যে প্রায় ৭০-৮০% শর্করা থাকে যা দেহগঠনে অংশগ্রহণ করে।

২। শক্তি সরবরাহ (Energy supply) : ১ গ্রাম শর্করার জারণে ৪।০ কিলোক্যালোরি শক্তি উৎপন্ন হয়। শর্করা মস্তিস্কে এবং ঐচ্ছিক পেশি সংকোচনে ও প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির প্রায় সবটাই সরবরাহ করে।

৩। সঞ্চয় (Storage) : শরীরে প্রযোজনের অতিরিক্ত শর্করা যকৃৎ ও পেশিতে গ্লাইকোজেন রূপে সঞ্চিত থাকে যা ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

৪। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ (Maintenance of blood sugar level) : স্বাভাবিকভাবে ১০০ ml রক্তে ৮০-৯০ mg গ্লুকোজ থাকে। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ হ্রাস পেলে যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন বিশ্লিষ্ট হয়ে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। আবার রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে গ্লুকোজ যকৃত ও পেশিতে গ্লাইকোজেন রূপে সঞ্চিত হয়। এইভাবে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৫। প্রোটিন বাঁচোয়া খাদ্য (Protein sparing food) : শরীরে প্রোটিনের অভাব হলে শর্করা থেকে অ্যামিনো এসিড সৃষ্টি হয় ও প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করে। ফলে দেহজ প্রোটিনের বিশ্লেষণ হয় না। এজন্য শর্করাকে প্রোটিন বাঁচোয়া খাদ্য বলে।

৬। প্রোটিন ও ফ্যাটের অপচিতি (Catabolism of protein and fat) : প্রোটিন থেকে উৎপন্ন অ্যামিনো এসিড ও ফ্যাট থেকে উৎপন্ন ফ্যাটি এসিডের জারণে শর্করা প্রয়োজন হয়।

৭। ল্যাক্টোজ সংশ্লেষ (Synthesis of lactose) : প্রাণিদেহে স্তনগ্রন্থি কোষে গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ থেকে ল্যাক্টোজ ও দুগ্ধ শর্করা সংশ্লেষিত হয়।

৮। প্রোটিন সংশ্লেষ (Protein synthesis) : শর্করা থেকে উৎপন্ন অ্যামিনো এসিড, প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে।

৯। স্নেহদ্রব্য সংশ্লেষ (Synthesis of fat) : যকৃতে শর্করা থেকে উৎপন্ন কিটো স্যুগার স্নেহদ্রব্য সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয়।

১০। র□যাফেজ (Roughage) : শর্করা মধ্যস্থ সেলুলোজ মানুষের পৌষ্টিকনালিতে পাচিত হয় না। তবে এটি অপাচ্য বস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধিতে ও মল তৈরিতে সাহায্য করে। এ ছাড়া এটি বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। সেলুলোজ পৌষ্টিকনালির স্বাভাবিক চলনেও সাহায্য করে। এর ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।

অ্যামিনো এসিড (Amino Acids) : অ্যামিনো এসিড প্রোটিনের মূল গঠনগত একক। এগুলো কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী এমিল ফিশার ও ফ্রেঞ্চ হোফমিস্টার (Emil Fisher and Franz Hopmeister) ১৯০২ সালে প্রোটিন অণুর গাঠনিক একক হিসেবে অ্যামিনো এসিড আবিষ্কার করেন। কোনো জৈব এসিডের এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) দ্বারা প্রতিস্থাপনের ফলে যে জৈব এসিড উৎপন্ন হয় তাকে অ্যামিনো এসিড বলা হয়। প্রতিটি অ্যামিনো এসিডে কমপক্ষে একটি অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) এবং একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ (-COOH) থাকে। এতে অন্যান্য কার্যকরী গ্রুপও থাকতে পারে। কাজেই অ্যামিনো এসিডের কার্যকরী গ্রুপ কী কী তার উপর নির্ভর করে সেই এসিডের গুণাবলী। উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন প্রকার অ্যামিনো এসিড আছে। এর মধ্যে ২০ প্রকার অ্যামিনো এসিড বিভিন্নভাবে সমন্বিত ও সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন তৈরি করে।

অ্যামিনো এসিডের সাধারণ গঠণ (General structure of amino acids) : অ্যামিনো এসিড এর কার্বোক্সিল গ্রুপ এর নিকটবর্তী কার্বন-পরমাণুটিকে Þ-কার্বন বলা হয় এবং কার্বোক্সিল গ্রুপটি Þ-কার্বনের সাথে যুক্ত থাকলে তাকে Þ-অ্যামিনো এসিড বলা হয়।

অ্যামিনো এসিডের রাসায়নিক গঠন (Chemical structure of amino acids) : অ্যামিনো এসিডের সাধারণ রাসায়নিক সংকেত হলো $R-CH.NH_2.COOH$। এখানে R হলো একটি হাইড্রোজেন পরমাণু বা কার্বনযুক্ত কোনো জৈব যৌগ। অ্যামিনো এসিডে একটি অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$), একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ (-COOH) এবং একটি পার্শ্বশিকল গ্রুপ (R) তাকে। তবে কোনো কোনো অ্যামিনো এসিডে ২টি অ্যামিনো গ্রুপ কিংবা ২টি কার্বোক্সিল গ্রুপ কিংবা সালফার থাকতে পারে। প্রকৃতিতে বেশিরভাগ অ্যামিনো এসিডই Þ-অ্যামিনো এসিড।

R-গ্রুপ H হলে অ্যামিনো এসিড গ্লাইসিন

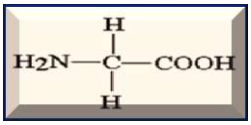

গ্লাইসিন

R-গ্রুপ CH_3 হলে অ্যামিনো এসিড এলানিন

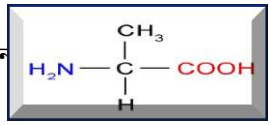

এলানিন

অ্যামিনো এসিডের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of amino acids) :

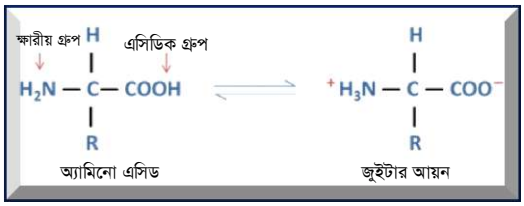

১। অ্যামিনো এসিড বর্ণহীন, স্বাদহীন, মিষ্টি বা তিক্ত ও স্ফটিকাকার পদার্থ।
২। এরা পানিতে দ্রবণীয় কিন্তু অ্যালকোহলে আর্দ্রবণীয়।
৩। মৃদু এসিড বা ক্ষারে এরা লবণ সৃষ্টি করে।
৪। এরা উচ্চ গলনাঙ্ক বিশিষ্ট।
৫। মানবদেহে বিদ্যমান প্রায় সবগুলো অ্যামিনো এসিডই Þ অ্যামিনো এসিড।
৬। এক বা একাধিক ধরনের অ্যামিনো এসিড পেপটাইড বন্ধনীর মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে প্রোটিন গঠন করে।
৭। এসিড ও ক্ষার বিশিষ্ট অ্যামিনো এসিডের মূলককে জুইটার আয়ন (Zuitter Ions; Zuitter = hybrid) বলে।

অ্যামিনো এসিডের শ্রেণিবিভাগ (Classification of amino acids) : যদিও প্রকৃতিতে ৭০০ অধিক অ্যামিনো এসিড রয়েছে এদের মধ্যে মাত্র ২০টি জীবদেহে বিভিন্নভাবে সজ্জিত হয়ে প্রোটিন গঠন করে। এদেরকে স্ট্যান্ডার্ড অ্যামিনো এসিড (standard amino acids) বলে। এসব অ্যামিনো এসিডকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিন্যাস্ত করা হয়। যেমন-

(ক) পুষ্টিগত গুরুত্বের ভিত্তিতে (Based on nutritional importance) : পুষ্টিগত গুরুত্বের ভিত্তিতে অ্যামিনো এসিড দুই প্রকার। যথা-

১। অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড (Essential amino acids) : দেহ গঠনের জন্য জরুরি যেসব অ্যামিনো এসিড প্রাণিদেহে সংশ্লেষিত হয় না এবং যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাদ্যের মাধ্যমে গৃহীত হয়, তাদের অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড বলে। যেমন- ভ্যালিন, লাইসিন, হিস্টিডিন ইত্যাদি।

২। অনত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড (Non-essential amino acids) : যেসব অ্যামিনো এসিড দেহে সংশ্লেষিত হয়, খাদ্যে যাদের উপস্থিতি জরুরি নয়, তাদের অনত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড বলে। যেমন- গ্লাইসিন, অ্যাসপারটিক এসিড, গ্লুটামিক এসিড ইত্যাদি।

(খ) রাসায়নিক গঠন ও কাজের ভিত্তিতে (On the basis of chemical composition and function) : রাসায়নিক গঠন ও কাজের উপর ভিত্তি করে অ্যামিনো এসিড তিন প্রকার। যথা-

১। অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিনো এসিড (Aliphatic amino acids) : অ্যামিনো এসিডের পার্শ্বশিকল গ্রুপটি অর্থাৎ R গ্রুপটি অ্যালিফ্যাটিক যৌগের হলে তাকে অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিনো এসিড বলে। যেমন- গ্লাইসিন, অ্যালানিন ইত্যাদি।

২। অ্যারোমেটিক অ্যামিনো এসিড (Aromatic amino acids) : অ্যামিনো এসিডের পার্শ্বশিকল গ্রুপটি অর্থাৎ R গ্রুপটি অ্যারোমেটিক যৌগের হলে তাকে অ্যারোমেটিক অ্যামিনো এসিড বলে। যেমন- ফিনাইল অ্যালানিন, টাইরোসিন ইত্যাদি।

৩। হেটারোসাইক্লিক অ্যামিনো এসিড (Heterocyclic amino acids) : যেসব অ্যামিনো এসিডের গঠন অ্যালিফ্যাটিক কিংবা অ্যারোমেটিক অ্যামিনো এসিড হতে ভিন্ন ধরনের তাদেরকে হেটারোসাইক্লিক অ্যামিনো এসিড বলে। যেমন- প্রোলিন, ট্রিপটোফ্যান ইত্যাদি।

(গ) প্রোটিন সৃষ্টির উপর ভিত্তি করে (Depends on the creation of proteins) : প্রোটিন সৃষ্টির উপর ভিত্তি করে অ্যামিনো এসিডকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১। প্রোটিনোজেনিক অ্যামিনো এসিড : যেসব অ্যামিনো এসিড প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে তাদের প্রোটিনোজেনিক অ্যামিনো এসিড বলে। প্রায় ২০টি অ্যামিনো এসিড প্রোটিনোজেনিক ধরনের।

২। নন-প্রোটিনোজেনিক অ্যামিনো এসিড : যেসব অ্যামিনো এসিড প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে না তাদের নন-প্রোটিনোজেনিক অ্যামিনো এসিড বলে। প্রায় ৭০০টির অধিক নন-প্রোটিনোজেনিক অ্যামিনো এসিড আছে যাদের মধ্যে প্রায় ৩০০টি কেবল উদ্ভিদে পাওয়া যায়।

অ্যামিনো এসিডের কাজ (Function of amino acids) : ১। প্রোটিন তৈরি তথা আমিষ সংশ্লেষণ করে। ২। জীবদেহ গঠনে ভূমিকা রাখে। ৩। কিছু ভিটামিন, এনজাইম, হরমোন ও এন্টিবডি সংশ্লেষে সাহায্য করে। ৪। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ৫। দেহে pH নিয়ন্ত্রণ করে। ৬। মেলানিন রঞ্জক সৃষ্টিতে সহায়তা করে। ৭। ইউরিয়া সংশ্লেষে সাহায্য করে।

প্রোটিন বা আমিষ (Protein) : গ্রিক *ÔProteiosÕ* হতে protein শব্দের উৎপত্তি। *ÔProteiosÕ* অর্থ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রোটিন জীবদেহের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক উপাদান। ডাচ রসায়নবিদ জুহানস মুলডার (Johannes Mulder) ১৮৩৮ সালে সর্বপ্রথম প্রোটিনের বর্ণনা করেন এবং সুইডিশ রসায়নবিদ জ্যাকব বারজিলিয়াস (Jacob Berzelius) এদের নামকরণ করেন। জীবকোষের সকল হরমোন, এনজাইম, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি প্রোটিন দ্বারা গঠিত। জীবজগতে যে সকল এনজাইম বিদ্যমান, তাদের কোনো না কোনো অংশ প্রোটিন দিয়ে গঠিত হয়। অপরদিকে জীবজগতে যে সকল প্রোটিন রয়েছে তারা সকলে এনজাইম হিসেবে কাজ করে না। তাই বলা যেতে পারে, সকল এনজাইম প্রোটিন, কিন্তু সকল প্রোটিন এনজাইম নয়।

সংজ্ঞা (Definition) : অনেকগুলো অ্যামিনো এসিড পেপটাইড বন্ধনীর মাধ্যমে একর পর এক শাখাহীন শৃঙ্খলের মতো সংযুক্ত হয়ে যে বৃহদাকার অণু গঠন করে তাকে আমিষ বা প্রোটিন বলে।

প্রোটিনের উৎস (Source of protein) : বিভিন্ ধরনের খাদ্যে প্রোটিন পাওয়া যায়। প্রাণিজ উৎস হিসেবে মাছ, মাংস ও ডিমে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যেও ব্যাপক প্রোটিন বিদ্যমান। শস্যদানা ও খাদ্যশস্যে কিছু পরিমাণ প্রোটিন থাকে। প্রোটিনের উদ্ভিজ্জ উৎস হলো ডাল, বাদাম, বীজ, ফল ইত্যাদি।

প্রোটিনের বিস্তার (Spread of proteins) : জীবদেহে প্রতিটি অঙ্গের গাঠনিক বস্তু হিসেবে প্রোটিন বিদ্যমান। কোষের বিভিন্ন অংশ, যথা- মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড, ক্রোমোজোম প্রভৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রোটিন। জীবদেহের জৈবনিক প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন এনজাইম, হরমোন, এন্টিবডি প্রভৃতি প্রোটিন দিয়ে তৈরি।

প্রোটিনের প্রকরণ (Variety of proteins) : প্রতিটি জীবদেহে অসংখ্য ধরনের প্রোটিন থাকে। একটি জীবদেহে যতটি জিনের প্রকাশ ঘটে ঐ দেহে তত ধরনের প্রোটিন থাকে। কাজেই হাজার হাজার ধরনের প্রোটিন একটি জীবদেহে থাকতে পারে। আবার দুটি প্রজাতির মধ্যে যেহেতু জিনগত পার্থক্য থাকে, সেহেতু এদের মধ্যে প্রোটিনের ধরনগত পার্থক্যও থাকে। একই প্রজাতির দুটি জীবের কিছুটা পার্থক্য থাকতে পারে, কাজেই একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যেও প্রোটিনের কাঠামোগত পার্থক্য থাকবে।

প্রোটিন সংশ্লেষণের স্থান (The place of protein synthesis) : জীবের কোষমধ্যস্থ রাইবোজোমে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

প্রোটিনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of proteins) :

১। প্রোটিন মূলত কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নিয়ে গঠিত। এছাড়াও এতে সালফার, ফসফরাস, লোহ, তামা ইত্যাদি উপাদানও থাকে।

২। এদেরকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে অ্যামিনো এসিড পাওয়া যায়।

৩। এটি কলয়েড প্রকৃতির, অধিকাংশ কেলাসিত। এটি পানিতে, লঘু এসিডে, ক্ষার ও মৃদু লবনে দ্রবণীয়। কিন্তু অ্যালকোহলে আর্দ্রবণীয়।

৪। এটি সাধারণত তড়িৎধর্মী ও বাফার দ্রবণ হিসেবে কাজ করে।

৫। প্রোটিনের গাঠনিক এককে ক্ষারীয় গ্রুপ ও অম্লীয় গ্রুপ থাকে বলে এরা ক্ষারীয় ও অম্লীয় উভয় গুণ বহন করে।

৬। এসিড প্রয়োগ করলে প্রোটিন তঞ্চিত (জমাট বাঁধা) হয়। এতে আণবিক গঠন পরিবর্তিত হয়।

৭। এগুলো বৃহৎ আকার বিশিষ্ট ও উচ্চ আণবিক গুরুত্বসম্পন্ন জৈব অণু।

প্রোটিনের গঠন (Protein structure) : প্রোটিন অণু আকারে বড় এবং কয়েক শত থেকে কয়েক হাজার অ্যামিনো এসিড একক নিয়ে গঠিত। বিভিন্ন অ্যামিনো এসিড বিভিন্নভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে এক একটি প্রোটিন গঠন করে। একটি অ্যামিনো এসিডের কার্বোক্সিল গ্রুপ (-COOH) অপর একটি অ্যামিনো এসিডের Þ-অ্যামিনো গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়ে যে অ্যামাইড বন্ড গঠন করে তাকে পেপটাইড বন্ড (peptide bond) বলে। প্রতিটি পেপটাইড বন্ড তৈরিতে এক অণু পানি নির্গত হয়। দুটি ভিন্ন অ্যামিনো এসিড যুক্ত হয়ে গঠন করে ডাইপেপটাইড, তিনটি যুক্ত হয়ে গঠন করে ট্রাইপেপটাইড, চার থেকে দশটি সংযুক্ত হয়ে গঠন করে অলিগোপেপটাইড। বিভিন্ন অ্যামিনো এসিডের প্রায় ৫০টি অণু পেপটাইড বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পলিপেপটাইড সৃষ্টি করে। প্রোটিন হলো পলিপেপটাইড যৌগ।

প্রোটিনের পলিপেপটাইড শিকলের উভয় প্রান্ত সর্বদা উন্মুক্ত থাকে। এদের একটিকে N প্রান্ত (অ্যামাইন প্রান্ত) এবং অপরটিকে C প্রান্ত (কার্বক্সিল প্রান্ত) বলে। প্রোটিনের ধরন পলিপেপটাইড শিকলের বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে।

জৈব রসায়নবিদগণ প্রোটিনের নিম্নলেখিত চার ধরনের গঠন বর্ণনা করেছেন।

১। প্রাইমারি গঠন : পেপটাইড বন্ধন দ্বারা যুক্ত অ্যামিনো এসিডের রৈখিক পলিপেপটাইড শিকল হলো প্রোটিনের প্রাইমারি গঠন। উদাহরণ- ইনসুলিন এনজাইম

২। সেকেন্ডারি গঠন : পলিপেপটাইড শিকল নিয়মিত ভাuজ খেয়ে প্রোটিনের যে গঠন সৃষ্টি করেতাকে সেকেন্ডারি গঠন বলে। এদের সাধারণত α–হেলিক্স ও β–প্লিটেড ধরনের শিকল থাকে। উদাহরণ- কেরাটিন, সিল্ক।

৩। টারসিয়ারি গঠন : পলিপেপটাইড শিকলে অ্যামিনো এসিডসমুহ ত্রিমাত্রিক সজ্জায় বিন্যস্ত থাকলে তাকে টারসিয়ারি গঠন বলে। উদাহরণ- ফাইব্রিনোজেন।

৪। কোয়ার্টানারি গঠন : দুই বা ততোধিক পলিপেপটাইড শিকল ডাইসালফেট বা হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়ে যে প্রোটিন গঠন করে তাকে কোয়ার্টানারি গঠন বলে।উদাহরণ- হিমোগ্লোবিন (এতে দুটি α শিকল ও β দুটি শিকল বিদ্যমান)।

চিত্র : প্রোটিনের চার ধরনের গঠন

প্রোটিনের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Protein) : প্রোটিনের গঠন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। যেমন- *Escherichia coli*-এর একটি কোষে প্রায় তিন হাজার প্রোটিন থাকে। মানবদেহে প্রোটিনের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। এসব প্রোটিন *Escherichia coli* থেকে আলাদা ধরনের। প্রোটিনের বিশাল রাজ্যে শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি বিভিন্ন প্রকার। তাই বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রোটিনকে শ্রেণিবিন্যস্ত করা হয়েছে।

(ক) জৈবিক কার্যাবলীর ভিত্তিতে (On the basis of biological functions) : জৈবিক কার্যাবলীর ভিত্তিতে প্রোটিন দুধরনের; যথা-

১। গাঠনিক প্রোটিন (Structural protein) : যেসব প্রোটিন জীবদেহের বিভিন্ন অংশ গঠনে অংশগ্রহণ করে, তাদেরকে গাঠনিক প্রোটিন বলে। এরা কোষ এবং টিস্যুর গঠনকে সুদৃঢ় করে। যেমন- কেরাটিন, কোলাজেন, কনড্রিন ইত্যাদি।

২। কার্যকরী প্রোটিন (Function protein) : যেসব প্রোটিন জীবদেহের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণ করে, তাদেরকে কার্যকরী প্রোটিন বলে। যেমন- এনজাইম, হরমোন, ভিটামিন ইত্যাদি।

(খ) আকৃতি অনুযায়ী (According to shape) : আকৃতি অনুযায়ী প্রোটিন তিন ধরনের; যথা-

১। তন্তুময় প্রোটিন (Fibrous protein) : যখন পলিপেপটাইডগুলো প্রোটিনে সমান্তরালভাবে একটি অক্ষ বরাবর সজ্জিত থাকে তখন তা লম্বা তন্তুর আকার ধারণ করে। এমন লম্বা আকৃতির প্রোটিনকে তন্তুময় প্রোটিন বলে। যেমন- কেরাটিন, কোলাজেন, ইলাস্টিন ইত্যাদি।

২। গ্লোবিউলার প্রোটিন (Globular protein) : যেসব প্রোটিনের গঠন গোলাকৃতির হয় তাদের গ্লোবিউলার প্রোটিন বলে। যেমন- হিমোগ্লোবিন, ইনসুলিন, মায়োগ্লোবিন ইত্যাদি।

৩। ইন্টারমেডিয়েট প্রোটিন (Intermediate protein) : পলিপেপটাইড শিকলগুলো যখন ফাইবার আকৃতির প্রোটিন গঠন করে তখন তাকে ইন্টারমেডিয়েট প্রোটিন বলে। এরাও পানিতে দ্রবণীয় এবং কোষের শারীরবৃত্তীয় কাজে অংশ গ্রহণ করে। যেমন- ফাইব্রিনোজেন।

(গ) ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলী ও দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে (On the basis of physio-chemical properties and solubility) : আধুনিক তথ্য অনুসারে ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলী ও দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে প্রোটিনকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ১। সরল প্রোটিন (simple protein), ২। যুগ্ম প্রোটিন (conjugated protein) ও ৩। উদ্ভুত বা উৎপাদিত প্রোটিন (derived protein)।

১। সরল প্রোটিন (Simple protein) : যেসব প্রোটিনকে এনজাইম, ক্ষার কিংবা এসিড দিয়ে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে কেবল অ্যামিনো এসিড বা এদের জাতক পাওয়া যায় তাদের সরল প্রোটিন বলে। এগুলো প্রকৃত প্রোটিন। দ্রবণীয়তার (solubility) ভিত্তিতে সরল প্রোটিন নিম্নলেখিত সাত প্রকার। যথা-

i. অ্যালবিউমিন (Albumin) : যেসব প্রোটিন পানি এবং লঘু লবণ দ্রবণে দ্রবীভূত হয়ে সাদা বর্ণের দ্রবণ তৈরি করে এবং তাপ প্রয়োগে জমাট বাঁধে, তাদেরকে অ্যালবিউমিন বলে। যেমন- দুধের ল্যাক্টো অ্যালবিউমিন (lacto albumin), শৈবালের লিউকোসিন (leucosin), শিমের লিগুমিন (legumin) ইত্যাদি।

ii. গ্লোবিউলিন (Globulin) : যেসব প্রোটিন পানিতে আর্দ্রবণীয়, কিন্তু গাঢ় এসিড বা ক্ষারের লঘু লবণ দ্রবণে দ্রবণীয় এবং তাপ প্রয়োগে জমাট বাঁধে, তাদেরকে গ্লোবিউলিন বলে। যেমন- রক্তরসের সিরামগ্লোবিউলিন (serum globulin), আলুর টিউবেরিন (tuberin), সয়াবিনের গ্লাইসিনিন (glycinin) ইত্যাদি।

iii. গ্লুটেলিন (Glutelin) : যেসব প্রোটিন পানি ও লবনে আর্দ্রবণীয়, কিন্তু এসিড বা লঘু ক্ষার দ্রবণে দ্রবণীয় এবং তাপ প্রয়োগে জমাট বাঁধে না, তাদেরকে গ্লুটেলিন বলে। শস্য দানায় এ জাতীয় প্রোটিন অধিক থাকে। যেমন- গমের গ্লুটেনিন (glutenin), চালের অরাইজেনিন (orygenin) ইত্যাদি।

iv. প্রোলামিন (Prolamin) : যেসব প্রোটিন পানি ও অ্যাবসলুট ইথানলে (১০০%) আর্দ্রবণীয় কিন্তু ৭০-৮০% ইথানলে দ্রবণীয় এবং তাপে জমাট বাঁধে না, তাদেরকে প্রোলামিন প্রোটিন বলে। এদেরকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে প্রচুর পরিমাণে প্রোলিন ও অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে। যেমন- ভুট্টার জেইন (zein), যব ও বার্লির হরডেইন (hordein) ইত্যাদি।

v. হিস্টোন (Histone) : যেসব প্রোটিন পানি অথবা পাতলা ক্ষার বা অম্ল দ্রবণে দ্রবণীয় কিন্তু অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্লোরাইডে আর্দ্রবণীয়, তাদেরকে হিস্টোন প্রোটিন বলে। এরা সাধারণত নিউক্লিয়াসের নিউক্লিক এসিডের সাথে হিস্টোন প্রোটিন হিসেবে যুক্ত থাকে। জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে হিস্টোন প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন- নিউক্লিয়াসের নিউক্লিওহিস্টোন।

vi. প্রোটামিন (Protamin) : যেসব প্রোটিন পানিতে, লঘু এসিডে এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে দ্রবণীয় এবং তাপে জমাট বাঁধে না, তাদেরকে প্রোটামিন প্রোটিন বলে। এরা ক্ষারধর্মী এবং সবচেয়ে ক্ষুদ্র ও কম আণবিক ওজন (৪০০০ ডালটন) বিশিষ্ট প্রোটিন। যেমন- হেরিং মাছের শুক্রাণুতে কুপিন, স্যালমনের শুক্রাণুতে স্যালমিন ইত্যাদি।

vii. স্ক্লেরোপ্রোটিন (Scleroprotein) : যেসব প্রোটিন পানিতে আর্দ্রবণীয় কিন্তু লঘু এসিড বা ক্ষারীয় দ্রবণে দ্রবণীয়, তাদেরকে স্ক্লেরোপ্রোটিন বলে। এ ধরনের প্রোটিন কেবল প্রাণিজগতে পাওয়া যায়। যেমন- শিং, নখ, চুলে কেরাটিন, চামড়ায় কোলাজেন ইত্যাদি।

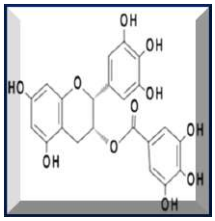
অ্যালবিউমিন

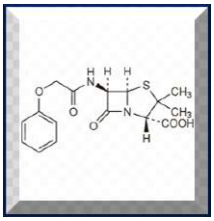
গ্লোবিউলিন

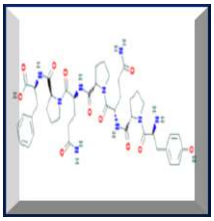
গ্লুটেলিন

প্রোলামিন

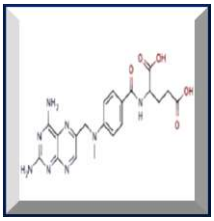
প্রোটামিন

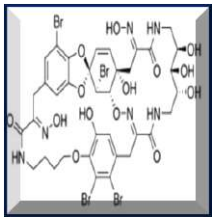
স্ক্লেরোপ্রোটিন

২। যুগ্ম প্রোটিন (Conjugated Protein) : যেসব প্রোটিনকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে অ্যামিনো এসিড ও একটি অপ্রোটিন অংশ উৎপন্ন করে, তাদেরকে যুগ্ম প্রোটিন বলে। যুগ্ম প্রোটিনের অপ্রোটিন অংশকে প্রোসথেটিক গ্রুপ বলে। সাধারণত প্রোসথেটিক গ্রুপ প্রোটিনের অ্যামিনো এসিডের পার্শ্ব শিকলের সাথে সমযোজী বা অসমযোজী বন্ধন দ্বারা স্থায়ীভাবে যুক্ত থাকে। যুগ্ম প্রোটিন নিম্নলেখিত প্রকারের হয়ে থাকে।

i. **নিউক্লিওপ্রোটিন (Nucleoprotein) :** যেসব প্রোটিনকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে সরল প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড পাওয়া যায়, তাদেরকে নিউক্লিওপ্রোটিন বলে। এগুলো পানিতে দ্রবণীয় এবং সামান্য অম্লীয়। কোষের নিউক্লিয়াসে, ভাইরাসে ও রাইবোজোমে এ ধরনের প্রোটিন পাওয়া যায়।

ii. **গ্লাইকোপ্রোটিন বা মিউকোপ্রোটিন (Glycoprotein or Mucoprotein) :** প্রোটিন অণুর সাথে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা (বিশেষ করে মনোস্যাকারাইড) যুক্ত থাকলে তাকে গ্লাইকোপ্রোটিন বা মিউকোপ্রোটিন বলে। এখানে প্রোসথেটিক গ্রুপ হলো কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা। এরা ক্ষারে দ্রবণীয় এবং অম্লীয় স্বভাবের। সকল কোষীয় আবরণীর গাঠণিক উপাদান হিসেবে বিদ্যমান থাকে। যেমন- যকৃতের প্লাজমা গ্লাইকোপ্রোটিন (plasma glycoprotein)।

iii. **লিপোপ্রোটিন (Lipoprotein) :** প্রোটিন অণুর সাথে লিপিড যুক্ত থাকলে, তাকে লিপোপ্রোটিন বলে। এটি পানিতে দ্রবণীয়, কিন্তু জৈব দ্রাবকে আর্দ্রবণীয়। কোষ আবরণীসহ সকল কোষীয় অঙ্গাণূর আবরণীর গাঠণিক উপাদান হিসেবে বিদ্যমান থাকে। যেমন- কাইলোমাইক্রন (chylomicron), এলডিএল (LDL), এইচডিএল (HDL) ইত্যাদি।

iv. **ফসফোপ্রোটিন (Phosphoprotein) :** যেসব প্রোটিনের সাথে প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে ফসফোরিক এসিড যুক্ত থাকে, সেগুলোকে ফসফোপ্রোটিন বলে। এটি পানিতে আর্দ্রবণীয়, কিন্তু ক্ষারকে দ্রবণীয়। যেমন- দুধের কেসিন, ডিমের ওভোভাইটেলিন ইত্যাদি।

v. **ক্রোমোপ্রোটিন (Chromoprotein) :** যেসব প্রোটিনের সাথে প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের রঞ্জক পদার্থ যুক্ত থাকে, সেগুলোকে ক্রোমোপ্রোটিন বলে। যেমন- শ্বসন রঞ্জক হিমোগ্লোবিন (haemoglobin), সালোকসংশ্লেষী রঞ্জক সাইটোক্রোম (cytochrome) ইত্যাদি।

vi. **মেটালোপ্রোটিন (Metaloprotein) :** যেসব প্রোটিনের অ্যামিনো এসিডের সাথে প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে কোনো ধাতু বা মেটাল (Fe, Mn, Mg, Zn) যুক্ত থাকে, সেগুলোকে মেটালোপ্রোটিন বলে। যেমন- সিডারোফিলিন, সেলোপ্লাজমিন ইত্যাদি।

vii. **ফ্লাভোপ্রোটিন (Flavoprotein) :** সরল প্রোটিনের সাথে ফ্লাভিন যুক্ত হয়ে যে প্রোটিন সৃষ্টি করে, তাকে ফ্লাভোপ্রোটিন বলে। যেমন- সাক্সিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ, NADH-ডিহাইড্রোজিনেজ ইত্যাদি।

৩। উদ্ভূত বা উৎপাদিত প্রোটিন (Derived Protein) : যে সকল প্রোটিন প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় থাকে না, এনজাইম, এসিড, ক্ষারক বা তাপের কারণে প্রাকৃতিক প্রোটিন অণু থেকে সৃষ্টি হয়, তাদেরকে উৎপাদিত প্রোটিন বলে। উৎপাদিত প্রোটিন দুই প্রকারের। যথা- (ক) প্রাথমিক উৎপাদিত প্রোটিন (primary derived protein) ও (খ) সেকেন্ডারি উৎপাদিত প্রোটিন (secondary derived protein)।

(ক) প্রাথমিক উৎপাদিত প্রোটিন (Primary derived protein) : এনজাইম বা এসিডের প্রভাবে যে প্রোটিন গঠিত হয়, তাকে প্রাথমিক উৎপাদিত প্রোটিন বলে। যেমন-

i. **প্রোটিয়েন (Protean) :** এটি পানিতে আর্দ্রবণীয়, এসিড, এনজাইম ও পানির ক্রিয়ায় সৃষ্ট। যেমন- এডেস্টিন থেকে এডেস্টান।

ii. **মেটাপ্রোটিন (Metaprotein) :** এরা পানিতে আর্দ্রবণীয় কিন্তু লঘু এসিড বা ক্ষারে দ্রবণীয়। যেমন- এসিড ও ক্ষারীয় প্রোটিন।

iii. **তঞ্চিত প্রোটিন (Coagulated protein) :** এরা পানিতে আর্দ্রবণীয়। প্রোটিনের উপর তাপ বা অ্যালহোহলের ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। যেমন- ডিমের জমাটবাধা সাদা অংশ।

(খ) সেকেন্ডারি উৎপাদিত প্রোটিন (Secondary derived protein) : প্রোটিন-এর আর্দ্র বিশ্লেষণের ফলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিন অণু সৃষ্টি হয়, তাকে সেকেন্ডারি উৎপাদিত প্রোটিন বলে। যেমন-

i. **প্রোটিওজ (Proteose) :** এরা পানিতে দ্রবণীয়। তাপে জমাট বাধে। যেমন- গ্লোবিউলিন থেকে গ্লোবিউলোজ।

ii. **পেপটোন (Peptone) :** এটি পানিতে দ্রবণীয় হয় না। লঘু এসিড ও এনজাইমের ক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়।

iii. **পলিপেপটাইড (Polypeptide) :** এরা পানিতে দ্রবণীয়। এনজাইম বা লঘু এসিডের প্রভাবে জটিল প্রোটিন আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে সৃষ্টি হয়।

জীবদেহে প্রোটিনের ভূমিকা (Role of Proteins in the Organism) : জীবদেহে প্রোটিনের ভূমিকা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জৈবিক বিভিন্ন তন্ত্রে প্রোটিনের গুরুত্ব অন্য সকল পদার্থ থেকে বেশি। জীবদেহে প্রোটিন গাঠনিক, এনজাইম, হরমোন, বিভিন্ন অণুর পরিবাহক প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করে। নিম্নে প্রোটিনের বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো :

১। প্রোটিন জীবকোষের একটি অন্যতম গাঠনিক জৈব রাসায়নিক উপাদান।
২। এটি জীবকোষ ও জীবদেহের প্রায় সকল বিপাকীয় কার্যকলাপের সাথে জড়িত। দেহের ক্ষয়পূরণ, গঠন ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
৩। এটি কোষের গাঠনিক উপাদান, জৈব অনুঘটক, দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসহ অসংখ্য কাজের নিয়ন্ত্রক।
৪। কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাটের অভাবে এটি দেহের অন্যতম শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে।
৫। জীবদেহের অভ্যান্তরে সংঘটিত সব বিক্রিয়া সুনির্দিষ্ট এনজাইম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এনজাইমের প্রধান উপাদান হলো প্রোটিন।
৬। কোষ অভ্যন্তরে বিভিন্ন অণুর পরিবহন, আয়ন স্থানান্তর প্রভৃতি প্রোটিনের সমন্বয়ে ঘটে থাকে।
৭। তন্তুজ প্রোটিন বিভিন্ন অঙ্গের আবরণী তৈরি, বিভিন্ন কলার মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে কাজ করে।
৮। ডিএনএ-তে সংরক্ষিত বংশগতির তথ্য প্রোটিন সংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।
৯। জীবের বৃদ্ধি ও বিকাশ হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভিন্ন হরমোন প্রোটিন দ্বারা গঠিত হয়।
১০। রক্তের হিমোগ্লোবিন নামক প্রোটিন প্রাণিদেহের সব কোষে অক্সিজেন সঞ্চালন করে।
১১। বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়ে দেহের বৃদ্ধি ঘটায়এবং প্রোটিনঘটিত অ্যান্টিবডি ও ইন্টারফেরন দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে।
১২। হিস্টোন প্রোটিন নিউক্রিয়াস ও নিউক্লিক এসিডকে কার্যকর করে।
১৩। রক্ততঞ্চনের জন্য থ্রম্বিন ও ফাইব্রিনোজেন অপরিহার্য হিসেবে কাজ করে।
১৪। শুক্রাণুর স্পার্মালাইসিন প্রোটিন ডিম্বাণুর আবরণী ভেদ করতে সহায়তা করে।
১৫। ইন্টারফেরন নামক বিশেষ প্রোটিন বাইরাস প্রতিরোধক হিসেবে ব্লাড ক্যান্সার নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।
১৬। প্রোটিনের গাঠনিক উপাদান অ্যামাইনো এসিড থেকে মাতৃদুগ্ধ প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

প্রোটিনের পুষ্টিগত গুরুত্ব (Nutritional importance of protein) :

১। দেহ গঠন (Body composition) : জীবদেহ গঠনের জন্য প্রোটিন অপরিহার্য। প্রোটিন ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। কোষের গঠনবস্তুর বেশিরভাগই প্রোটিনযুক্ত। দেহের অস্থি, তরুণাস্থি, পেশি, কিউটিকল, পশু-পাখির পালক, রোম, নখ, শিং প্রভৃতি প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয়।

২। দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি (Replenishment and growth of the body) : দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধির জন্য প্রোটিন অপরিহার্য। বিভিন্ন জৈবনিক ক্রিয়াকলাপ, যেমন- চলন. রেচন, জনন ইত্যাদি সম্পন্ন করার জন্য দেহের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তা পূরণ করার জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া প্রাণির বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত চলে। এই বৃদ্ধি দশায় প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের অভাব হলে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

৩। শক্তির উৎস (Source of energy) : বিশেষ প্রয়োজনে প্রোটিন দেহে শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। ১ গ্রাম প্রোটিন জারনে ৪।১ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়। দেহে শর্করার অভাব হলে প্রোটিন জারণের দ্বারা শক্তি উৎপন্ন হয়।

৪। উৎসেচক সংশ্লেষ (Enzyme synthesis) : জীবদেহে উৎসেচক জৈব অণুঘটকরূপে কাজ করে। এই উৎসেচক প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয়। দেহের বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া অর্থাৎ বিভিন্ন জটিল যৌগের সংশ্লেষ কিংবা জটিল যৌগের ভাঙ্গনের জন্য উৎসেচক আবশ্যক। অর্থাৎ প্রোটিন পরোক্ষভাবে জীবদেহের বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

৫। হরমোন সংশ্লেষ (Hormone synthesis) : জীবদেহে হরমোন রাসায়নিক দূত হিসেবে কাজ করে।জীবদেহকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখার জন্য হরমোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বিশেষ কয়েকটি হরমোন, যেমন- ইনসুলিন, সোমাটোট্রফিক ইত্যাদি মূলত প্রোটিন দিয়ে তৈরি।

৬। হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষ (Hemoglobin synthesis) : রক্তের হিমোগ্লোবিন এক :রনের যুগ্ম প্রোটিন যা গ্লোবিন নামক প্রোটিন ও হিম নামক রঞ্জকের সমন্বয়ে গঠিত হয। হিমোগ্রোবিন দেহে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

৭। জিনের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ (Gene function control) : ক্রোমোজোমের স্থায়িত্ব রক্ষায় এবং জিনের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণে হিস্টোন প্রোটিন বিশেষ ভূমিকা পারন করে।

৮। প্রোটোপ্লাজম সংশ্লেষণ (Protoplasm synthesis) : প্রতিটি সজীব কোষের প্রোটোপ্লাজম প্রোটিনের মূল গাঠনিক একক অ্যামিনো এসিড থেকে সংশ্লেষিত হয়।

৯। অঙ্কুরোদগমে সহায়তা (Assist in germination) : বীজে অবস্থিত কিছু প্রোটিন বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় খাদ্য সরবরাহ করে।

১০। আয়ন পরিবহন (Ion transport) : উদ্ভিদে আয়নের বাহক হিসেবে প্রোটিন ভূমিকা রাখে বলে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন।

১১। দর্শনে ভূমিকা (Role to viewing) : চোখের রেটিনার ফটোরিসেপ্টর প্রোটিন দর্শনে ভূমিকা রাখে।

১২। সাম্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ (Equilibrium control) : রক্তের প্রাজমাপ্রোটিন রক্তের হোমিওস্টেসিস ও কোলয়ডাল অভিস্রবণিক চাপ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

১৩। রক্ত তঞ্চনে (Blood clots) : রক্তের প্রাজমাপ্রোটিন (যেমন- প্রোথ্রম্বিন, ফাইব্রিনোজেন ইত্যাদি) বাতাসের সংস্পর্শে রক্ত তঞ্চনে সহায়তা করে।

১৪। ইউরিয়া ও মেলানিন সংশ্লেষ (Urea and melanin synthesis) : প্রোটিনের গাঠনিক উপাদান অ্যামিনো এসিড (যেমন- আর্জিনিন, টাইরোসিন) থেকে যকৃতে ইউরিয়া ও মেলানিন সংশ্লেষিত হয়।

খাদ্য তালিকায় প্রোটিন (Protein in the Diet list) : আমাদের খাদ্য তালিকায় প্রোটিন জাতীয় খাবার রাখা অপরিহার্য, কারণ শরীর গঠনে প্রোটিনের ভূমিকা মুখ্য। বিভিন্ন প্রকার খাদ্যে বিভিন্ন পরিমাণে প্রোটিন থাকে। পরিমাণের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রোটিন থাকে বিভিন্ন ডাল জাতীয় খাবারে কিন্তু এরপরেও পুষ্টিবিজ্ঞানীগণ প্রাণিজ প্রোটিনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

প্রোটিন তৈরি হয় ২০ প্রকার অ্যামিনো এসিড দিয়ে। গাঠনিক ইউনিট হিসেবে এই ২০ প্রকার অ্যামিনো এসিডেই অত্যাবশ্যকীয়। মানবদেহের চাহিদা অনুসারে মাত্র ৮টি অ্যামিনো এসিড (লিউসিন, আইসোলিউসিন, লাইসিন, মেথিওনিন, থিওনিন, ভ্যালিন, ফিনাইল অ্যালানিন এবং ট্রিপ্টোফ্যান) কে অত্যাবশ্যকীয় (essential) অ্যামিনো এসিড বলা হয়। এর কারণ হলো অন্য ১২টি অ্যামিনো এসিড আমাদের দেহাভ্যন্তরে সংশ্লেষিত হতে পারে কিন্তু উক্ত ৮টি অ্যামিনো এসিড দেহাভ্যন্তরে সংশ্লেষিত হয় না, খাদ্যের মাধ্যমে দেহে গৃহীত হয়। শিশুদের জন্য অরজিনিন এবং হিস্টিডিন অত্যাবশ্যকীয়। অর্থাৎ শিশুদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড ১০টি।

সব প্রোটিনে সব অ্যামিনো এসিড থাকে না, তাই যে সব প্রোটিনে সবকটি অত্যবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড থাকে খাদ্য তালিকায় সেগুলোই প্রাধান্য দেয়া উচিত। এদিক থেকে প্রাণিজ প্রোটিনই (মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি) অগ্রগামী এবং উদ্ভিজ্জ প্রোটিন (যেমন- ডাল) অনুগামী।

প্রকৃতপক্ষে প্রোটিনের মান বিচারে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিডসমুহের উপস্থিতিই প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। অত্যাবশ্যকীয় ৮টি অ্যামিনো এসিডের একটিও যদি মিনিমাম আদর্শ পরিমাণের চেয়ে কম থাকে তা হলেই এর মান কমে যায়। কারণ দেহ সঠিক পরিমাণে তা শোষণ করতে পারে না। মানের দিক থেকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন পিছনে থাকার এটিই কারণ। আদর্শ প্রোটিন পাওয়া যায় ডিম এবং দুধে। তাই এ দুটি আদর্শ খাবার। চালের প্রোটিন এবং ডালের প্রোটিন এক সাথে হলে একটির অভাব অপরটি কিছুটা পূরণ করে, তাই চাল-ডালের খিচুড়ির পুষ্টিমান ভাত এবং ডালের চেয়ে উপরে।

প্রাণিজ প্রোটিন (মাছ, মাংস, ডিম) অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড সমৃদ্ধ হওয়ায় পৃথিবীর সবদেশে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এশিয়ান ও আফ্রিকানদের চেয়ে উত্তর আমেরিকা অনেক বেশি পরিমাণ প্রাণিজ প্রোটিন আহার করে। উন্নত দেশগুলোতে ক্যালোরির ৪০%, আর উন্নয়নশীল দেশে ২৩% আসে প্রাণিজ খাদ্য থেকে। পৃথিবীতে উৎপাদিত গবাদি পশুর মাংসের এক-চতুর্থাংশ ভোগ করে উত্তর আমেরিকানরা।

আদর্শ প্রোটিন : প্রতি ১০০ গ্রাম আদর্শ প্রোটিনে অ্যামিনো এসিডের পরিমাণ (গ্রাম)

	আইসোলিউসিন	লিউসিন	লাইসিন	ফিনাইল অ্যালানিন	মেথিওনিন	থ্রিওনিন	ট্রিপ্টোফ্যান	ভ্যালিন
আদর্শ প্রোটিন	৪.৩	৪.৯	৪.৩	২.৯	২.৩	২.৯	১.৪	৪.৩
ডিম	৬.৮	৯.০	৬.৩	৬.০	৩.১	৫.০	১.৭	৭.৪
গরুর দুধ	৬.৪	৯.৯	৭.৮	৪.৯	২.৪	৪.৬	১.৪	৬.৯
মসুর ডাল	৫.২	৬.৯	৬.১	৪.১	০.৬	৩.৬	০.৮	৫.৫
মাছ	৬.৫	৯.৫	৯.০	৪.৪	৩.২	৪.৭	১.২	৬.০
মাংস	৫.২	৭.৮	৮.৬	৩.৯	২.৭	৪.৪	১.০	৫.১

বি. দ্র : ডিম এবং দুধ আদর্শ প্রোটিন। মাছ-মাংসে ট্রিপ্টোফ্যান আদর্শ মাত্রার চেয়ে কম। ডালে মেথিওনিন ও ট্রিপ্টোফ্যান আদর্শ মাত্রার চেয়ে কম। কাজেই মাছ-মাংস প্রকৃতপক্ষে আদর্শ প্রোটিন নয়। ডালের প্রোটিন আরও নিম্নমানের।

প্রোটিনের দৈনিক চাহিদা (Daily demand of protein) : মানবদেহের পেশি, অস্থি ও অন্যান্য গঠন এবং বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদানের জন্য প্রতিদিন প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। একজন সুস্থ্য মানুষের বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন মাত্রায় প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। নিম্নে মানুষের দৈনিক প্রোটিনের চাহিদার একটি তালিকা দেয় হলো :

৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর	১০ গ্রাম
৬-১২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর	১৯-৩৪ গ্রাম
১৩-১৯ বছর বয়স পর্যন্ত কিশোরের	৫২ গ্রাম
১৩-১৯ বছর বয়স পর্যন্ত কিশোরীর	৪৬ গ্রাম
পরিণত পুরুষের	৫৬ গ্রাম
পরিণত মহিলার	৪৬ গ্রাম
গর্ভবতী কিংবা প্রসূতি মহিলার	৭১ গ্রাম

লিপিড (Lipid) : লিপিড হলো জীবদেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক যৌগ যেগুলো হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন সমন্বয়ে গঠিত, পানিতে আর্দ্রবণীয় কিন্তু কিছু জৈব দ্রাবক যেমন- অ্যালকোহল, বেনজিন, ইথার ইত্যাদিতে দ্রবণীয় এবং কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনের সাথে জীবকোষের প্রধান গাঠনিক উপাদান হিসেবে বিদ্যমান থাকে।

জার্মান জৈব রসায়নবিদ ব্লোর (Bloor, 1943) সর্বপ্রথম লিপিড শব্দটি ব্যবহার করেন। গ্রিক শব্দ *lipos* (= ফ্যাট) থেকে lipid শব্দটির উৎপত্তি, যার বাংলা প্রতিশব্দ হলো স্নেহ পদার্থ। লিপিড দেহের বিভিন্ন অংশে মজুদ থাকতে পারে। জীবদেহের মাত্র ০.৫% লিপিড দ্বারা গঠিত। বিশ্রামরত অবস্থায় শক্তি চাহিদার ৭৫% শক্তি ফ্যাট জারণের ফলে সরবরাহ হয়। লিপিড প্রধানত স্নেহ ও তেল রূপে বিদ্যমান থাকে। শক্ত ও কঠিন লিপিডকে স্নেহ বা চর্বি (fat) এবং তরল লিপিডকে তেল (oil) বলা হয়। লিপিডের নির্দিষ্টকোনো গলনাঙ্ক নেই।

লিপিডের উৎস (Source of lipid) : উদ্ভিদ ও প্রানী উভয় উৎস থেকেই লিপিড পাওয়া যায়। প্রকৃতিতে লিপিড সাধারণত স্নেহ ও তেলরূপে বিদ্যমান। লিপিডের উৎস দুধরনের-

১। প্রাণিজ উৎস (Animal source) : প্রাণিজ চর্বি, ঘি, মাখন, বাটার, ডিম ইত্যাদি হচ্ছে লিপিডের প্রাণিজ উৎস।

২। উদ্ভিজ্জ উৎস (Plant source) : কিছু উদ্ভিদের বীজ যেমন- বাদাম, সয়াবিন, নারিকেল, সরিষা, সূর্যমুখী, তিল, তিসি, পাম, জলপাই ইত্যাদি হচ্ছে লিপিডের উদ্ভিজ্জ উৎস। উদ্ভিদের ফল ও বীজে অধিক পরিমাণ লিপিড এবং মূল, কাণ্ড ও পাতায় অল্প পরিমাণে লিপিড সঞ্চিত থাকে।

লিপিডের গঠন (Structure of lipid) : লিপিড সাধারণত ফ্যাটি এসিডের এস্টার। সাধারণত ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলের সমন্বয়ে লিপিড গঠিত। এদেরকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল পাওয়া যায়। লিপিডের গঠন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। ফসফোলিপিডে ফ্যাটিএসিড, গ্লিসারল, ফসফরাস ও নাইট্রোজেন ক্ষারক উপস্থিত থাকে। গ্লাইকোলিপিডে থাকে ফ্যাটি এসিড ও কার্বোহাইড্রেট। তেল জাতীয় লিপিডে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল থাকে। আর মোম জাতীয় লিপিডে থাকে ফ্যাটি এসিড ও অ্যালকোহল। লিপিড সাধারণত তেল, চর্বি, মোম ও আরও সমজাতীয় উপাদান নিয়ে গঠিত বলে এদেরকে হেটারোজেনাস (heterogenous) বা মিশ্র গোষ্ঠী যৌগ বলা হয়।

লিপিডের রাসায়নিক উপাদান (Chemical component of lipid) : বিভিন্ন লিপিড বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানে গঠিত। তবে লিপিড প্রধানত কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সমন্বয়ে গঠিত হয়। এছাড়াও লিপিডে ফসফরাস, সালফার ও নাইট্রোজেন থাকতে পারে। সাধারণত গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিডই বেশিরভাগ লিপিডে থাকে। মোম জাতীয় লিপিডে গ্লিসারলের পরিবর্তে অ্যালকোহল বা কোলেস্টেরল থাকে। উৎপাদিত লিপিডে অসংখ্য আইসোপ্রিন একক থাকে। যৌগিক লিপিডে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলের সাথে ফসফরাস ও নাইট্রোজেন বেস থাকে। লিপিড সাধারণত তেল, চর্বি, মোম ও আরও সমজাতীয় উপাদান নিয়ে গঠিত বলে এদেরকে হেটারোজেনাস বা মিশ্র গোষ্ঠী যৌগ বলা হয়।

লিপিডের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of lipid) :

১। লিপিড বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন জৈব পদার্থ।
২। এরা পানিতে আর্দ্রবণীয় কিন্তু ইথার, ক্লোরোফর্ম, বেনজিন ইত্যাদি জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়।
৩। লিপিড পানি অপেক্ষা হালকা এবং এর সুনির্দিষ্ট কোনো গলনাঙ্ক নেই।
৪। এরা সাধারণত ফ্যাটি এসিডের এস্টার হিসেবে কাজ করে।
৫। এদেরকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল পাওয়া যায়।
৬। এরা জীবদেহে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনের সাথে গাঠণিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।
৭। এরা কোষে সঞ্চিত উপাদান হিসেবে থাকে এবং প্রয়োজনে শক্তি উৎপাদন করে।
৮। সাধারণ তাপমাত্রায় (২০°সে.) কঠিন লিপিডকে চর্বি (fat) এবং তরল লিপিডকে তেল (oil) বলে।

লিপিডের কাজ (Function of lipid) :

১। চর্বি ও তেল জাতীয় লিপিড উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে জমা থাকে। বিভিন্ন তেলবীজের (সরিষা, তিল, সয়াবিন ইত্যাদি) অঙ্কুরোদগমকালে লিপিড খাদ্যরূপে গৃহীত হয়। এদের বিজারণকালে অধিক () তৈরি হয়।
২। ফসফোলিপিড বিভিন্ন মেমব্রেন গঠনে উপাদান হিসেবে কাজ করে।
৩। মোম জাতীয় লিপিড পাতার বহিরাবরণে স্তর (কিউটিকল) সৃষ্টি করে অতিরিক্ত প্রস্বেদন রোধ করে।
৪। কতিপয় এনজাইমের প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে ফসফোলিপিড কাজ করে। এছাড়া ফসফোলিপিড আয়নের বাহক হিসেবেও কাজ করে।
৫। সালোকসংশ্লেষণে গ্লাইকোলিপিড বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
৬। প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে লিপোপ্রোটিন গঠন করে এবং লিপোপ্রোটিন শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে।

লিপিডের রাসায়নিক পরীক্ষা (Chemical testing of lipid) :

১। সাকোস্কি পরীক্ষা (Salkoeski test) : নমুনাকে ক্লোরোফর্মে দ্রবীভূভত করে সম পরিমাণ গাঢ় H_2SO_4 যোগ করতে হবে। লিপিড থাকলে উহা নীলাভ-লাল বা কালচে-লাল বর্ণ ধারণ করবে।

২। লিবারম্যান-বারচারড পরীক্ষা (Liebermann-Burchard test) : নমুনাকে ক্লোরোফর্মে দ্রবীভূভত করে কয়েক ফোটা অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড ও কয়েক ফোটা গাঢ় H_2SO_4 যোগ করতে হবে। লিপিড থাকলে উহা প্রথমে লাল, পরে নীল ও সবশেষে নীলাভ-সবুজ বর্ণ ধারণ করবে।

লিপিডের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of lipid) : লিপিডকে বিভিন্ন উপায়ে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়, যেমন-

(ক) আণবিক গঠন অনুযায়ী (According to molecular structure) : আণবিক গঠনের উপর ভিত্তি করে লিপিডকে প্রধানত ৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ১। নিউট্রাল লিপিড, ২। ফসফোলিপিড, ৩। গ্লাইকোলিপিড, ৪। টারপিনয়েডস ও ৫। মোম।

(খ) রাসায়নিক গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী (According to the nature of the chemical composition) : রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তি করে লিপিডকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ১। সরল লিপিড, ২। যৌগিক লিপিড ও ৩। উৎপাদিত লিপিড।

১। সরল লিপিড (Simple lipids) : যেসব লিপিডকে বিশ্লেষণ করলে লিপিড বা স্নেহদ্রব্য ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না তাদেরকে সরল লিপিড বলে। এরা সাধারণত ফ্যাটি এসিড ও বিভিন্ন অ্যালকোহলের এস্টার। সরল লিপিড প্রধানত দুই ধরনের। যথা- (ক) স্নেহদ্রব্য ও (খ) মোম।

(ক) স্নেহদ্রব্য (Fat) : গ্লিসারলযুক্ত ফ্যাটি এসিডের এস্টারই হলো স্নেহদ্রব্য। এটি তিন অণু ফ্যাটি এসিড ও এক অণু গ্লিসারল নিয়ে গঠিত। এদরেকে ট্রাইগ্লিসারাইড বলে। ট্রাইগ্লিসারাইড দুই ধরনের। যথা- চর্বি ও তেল।

চর্বি (Fat) : যেসব ট্রাইগ্লিসারাইড সম্পৃক্ত (saturated) ফ্যাটি এসিড তৈরি করে এবং সাধারণ তাপমাত্রায় (২০°সে.) কঠিন অবস্থায় থাকে তাদেরকে চর্বি বলে। এদের গলনাঙ্ক প্রায় ৭০° সেলসিয়াসের কাছাকাছি। প্রাণিজ চর্বি- মাছের তেল, বাটার, ঘি; উদ্ভিজ্জ চর্বি- নারকেল তেল, পাম ওয়েল ইত্যাদি চর্বির উদাহরণ।

তেল (Oil) : যেসব ট্রাইগ্লিসারাইড অসম্পৃক্ত (unsaturated) ফ্যাটি এসিড গঠন করে এবং সাধারণ তাপমাত্রায় (২০° সে.) তরল অবস্থায় থাকে তাদেরকে তেল বলে। এদের গলনাঙ্ক খুব কম, মাত্র ৫° সেলসিয়াসের কাছাকাছি। যেমন- সাধারণ ভোজ্য তেল।

স্নেহদ্রব্যের কাজ ও গুরুত্ব (Functions and importance of fats) : ১। স্নেহদ্রব্য উদ্ভিদের ফল ও বীজে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে জমা থাকে। ২। জীবদেহে স্নেহদ্রব্য শ্বসনিক বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ৩। বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় কার্বোহাইড্রেটে রূপান্তরিত হয়ে চারার খাদ্য ও শক্তি যোগায়। ৪। মানুষ খাদ্য হিসেবে (যেমন- প্রাণিজ চর্বি, ভোজ্য তেল, ঘি ইত্যাদি) গ্রহণ করে। ৫। প্রসাধন শিল্পেও স্নেহদ্রব্য ব্যবহৃত হয়। ৬। চর্বি দেহে LDL মাত্রা বৃদ্ধি করে যা হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

(খ) মোম (Wax) : ফ্যাটি এসিড ও মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল এস্টারিভূত হয়ে যে দীর্ঘ শিকল বিশিষ্ট রাসায়নিক জৈব যৌগ গঠন করে তাকে মোম বলে। সাধারণ তাপমাত্রায় মোম কঠিন অবস্থায় থাকে। এদের ফ্যাটি এসিডের কার্বন সংখ্যা ১৪-৩৬ পর্যন্ত এবং অ্যালকোহলের কার্বন সংখ্যা ১৬-৩৬ পর্যন্ত হতে পারে। মোম পানিতে আর্দ্রবণীয়, কিন্তু কিছু কিছু জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়। এগুলো রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় পদার্থ। মোমের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১ এর কম। উদ্ভিদের কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফলের ত্বকে মোম পাওয়া যায়।

মোমের কাজ ও গুরুত্ব (The function and importance of wax) : ১। মোম উদ্ভিদের কাণ্ড, পাতা, ফল ইত্যাদি উপর পানি প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। ২। পাতা ও কচি কান্ডে কিউটিকল সৃষ্টির মাধ্যমে প্রস্বেদন কমাতে সাহায্য করে। ৩। মোমবাতি তৈরিতে মোম ব্যবহৃত হয়। ৪। বিভিন্ন প্রসাধন শিল্পে ও গবেষণাগারের ব্যবহারিক ট্রে তৈরিতেও মোম ব্যবহৃত হয়। ৫। ফল সংরক্ষণেও এর ব্যবহার রয়েছে।

২। যৌগিক লিপিড (Compound lipid) : সরল লিপিডের সাথে অন্য কোনো অ-লিপিড বা প্রোসথেটিক গ্রুপ সংযুক্ত হয়ে যে লিপিড গঠিত হয়, তাদের যৌগিক লিপিড বলে। যৌগিক লিপিড তিন ধরনের। যথা- (ক) ফসফোলিপিড, (খ) গ্লাইকোলিপিড ও (গ) লিপোপ্রোটিন।

(ক) ফসফোলিপিড (Phospholipid) : গ্লিসারল, ফ্যাটি এসিড ও ফসফোরিক এসিড সমন্বয়ে গঠিত যৌগকে ফসফোলিপিড বলে। এর বিশেষ রাসায়নিক উপাদান হলো ফসফোটাইডিক এসিড। এর ফসফেট গ্রুপটি কোলিন সহযোগে এস্টারিভূত হয়ে লেসিথিন উৎপন্ন করে। কোষ আবরণীসহ সকল কোষীয় অঙ্গাণুর আবরণীর অন্যতম রাসায়নিক উপাদান হলো ফসফোলিপিড। লেসিথিন, সেফালিন, কোলিন, প্লাজমোজেন ইত্যাদি উল্লেখযেগ্য ফসফোলিপিড।

কাজ : ১। ফসফোলিপিড কোষ আবরণী গঠন করে এবং সাইটোপ্লাজমকে ধারন করে। ২। এটি কোষের ভেদ্যতা ও পরিবহন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং গ্লুকোজ, পানি ও চার্জযুক্ত আয়নের ব্যাপন রোধ করে। ৩। এটি কোষের অভ্যন্তরীণ স্থিতিবস্থা বজায় রাখে। ৪। এটি কোষের আয়ন বাহক হিসেবে কাজ করে। ৫। এটি রক্ত তঞ্চণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ৬। কতিপয় এনজাইমের প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে কাজ করে।

(খ) গ্লাইকোলিপিড (Glycolipid) : সরল লিপিডের সাথে যখন কার্বোহাইড্রেট যুক্ত থাকে তখন তাকে গ্লাইকোলিপিড বলে। এখানে কার্বোহাইড্রেট হিসেবে গ্লুকোজ বা গ্যালাকটোজ থাকে। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণকারী অঙ্গে ফসফোলিপিড অপেক্ষা গ্লাইকোলিপিড বেশি থাকে। তুলা ও সূর্যমুখীর বীজে গ্লাইকোলিপিড পাওয়া যায় এবং এখান থেকে গ্লাইকোলিপিড শনাক্ত করা হয়েছে। যেমন- সেরিব্রোন, নারভন ইত্যাদি।

কাজ : ১। ফটোসিনথেটিক অঙ্গাণু গঠন করে সালোকসংশ্লেষণে ভূমিকা রাখে। ২। এরা মানুষের রক্ত গ্রুপিং সৃষ্টি করে। ৩। এরা দেহের ভেতরে ভাইরাস শনাক্তকরণের মাধ্যমে দেহের অনাক্রম্য সাড়া প্রদানে ভূমিকা রাখে।

(গ) লিপোপ্রোটিন (Lipoprotein) : প্রোটিনের সাথে লিপিড যুক্ত হয়ে যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ গঠিত হয় তাকে লিপোপ্রোটিন বলে। লিপিড কিংবা লিপিড জাতক সমযোজক বা অসমযোজক দ্বারা প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়। এদের লিপিড অংশ কোলেস্টেরল, এস্টার এবং ফসফোলিপিড দিয়ে গঠিত। কোষের মাইটোকন্ড্রিয়া ক্লোরোপ্লাস্ট আবরণীতে লিপোপ্রোটিন থাকে।

কাজ : ১। লিপোপ্রোটিন কোষ অঙ্গাণুর গাঠনিক উপাদান হিসেবে বিদ্যমান থাকে। ২। এরা মাইট্রোকন্ড্রিয়াতে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের সাথে জড়িত থেকে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে। ৩। কোলেস্টেরল ও চর্বি পরিবহনে ভূমিকা রাখে।

৩। উৎপাদিত বা উদ্ভুত লিপিড (Derived lipids) : কোষাভ্যন্তরে এনজাইম কিংবা রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা সরল ও যুগ্ম প্রোটিন আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে যেসব ক্ষুদ্র প্রোটিন অণু সৃষ্টি করে তাদের উৎপাদিত প্রোটিন বা উদ্ভুত প্রোটিন বা জাতক প্রোটিন বলে। যেমন- স্টেরয়েড, টারপিনস, রাবার ইত্যাদি। নিম্নে কয়েকটি উৎপাদিত প্রোটিনের উদাহরণ উল্লেখ করা হলো-

(ক) স্টেরয়েড (Steroids) : ২৭-২৯ কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট আইসোপ্রেনয়েড যৌগকে স্টেরয়েড বলে। যে সকল স্টেরয়েডে হাইড্রোক্সিল (-OH) গ্রুপ থাকে তাদের স্টেরল (sterol) বলে। ব্যাকটেরিয়া ও সায়ানো ব্যাকটেরিয়া ছাড়া অন্যান্য উদ্ভিদে স্টেরল বিদ্যমান। এরা উদ্ভিদে মুক্ত অথবা গ্লাইকোসাইড হিসেবে বিরাজ করে। কোলেস্টেরল (cholesterol), স্টিগমাস্টেরল (stigmasterol) আর্গস্টেরল (ergosterol) ইত্যাদি স্টেরয়েডস এর উদাহরণ।

(খ) টারপিনস (Terpenes) : ১০-৪০টি কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট আইসোপ্রেনয়েড একক এর সমন্বয়ে টারপিন গঠিত। এটি মনোটারপিন, ডাইটারপিন ইত্যাদি প্রকারের হয়ে থাকে। এর সাধারণ সংকেত $(C_5H_8)_n$ । মেনথল, কর্পুর, থাইমল প্রভৃতি টারপিনস-এর উদাহরণ। পুদিনা, তুলসী, পাইন বৃক্ষ ইত্যাদিতে উদ্বায়ী তেল হিসেবে টারপিনস পাওয়া যায়।

(গ) রাবার (Rubber) : রাবার এক ধরনের লিপিড জাতক। প্রায় ৩০০০-৬০০০ আইসোপ্রেন একক যুক্ত হয়ে রাবার তৈরি হয়। *Hevea brasiliensis* নামক উদ্ভিদ থেকে প্রাকৃতিক রাবার পাওয়া যায়। এছাড়া *Ficus elastica, Castilla elastica* ইত্যাদি বৃক্ষ থেকেও সামান্য পরিমাণ রাবার সংগ্রহ করা যায়। প্রাকৃতিক রাবার ছাড়াও কৃত্রিমভাবে রাবার উৎপাদন করা হয়। এদের গাম রাবার বলে।

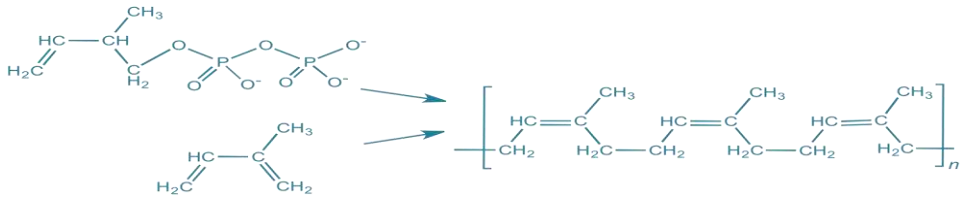

চিত্র : সিআইএস-পলিসোপ্রিনের রাসায়নিক গঠন, প্রাকৃতিক রাবারের প্রধান উপাদান

জীবদেহে লিপিডের ভূমিকা (The role of lipids in the organism) :

১। শক্তির উৎস (Source of energy) : লিপিড এক ধরনের উচ্চশক্তির খাদ্য। উদ্ভিদের বীজ ও অনেক প্রাণির শক্তির প্রধান উস হচ্ছে সঞ্চিত লিপিড। এদের সরবরাহকৃত শক্তির পরিমাণ ৯।৩ Kcal/gm।

২। খাদ্য ভান্ডার (Food stores) : লিপিড জীবদেহে সঞ্চিত থেকে খাদ্য ভান্ডার হিসেবে কাজ করে এবং প্রাণিদেহে অতি উচ্চমাত্রায় ক্যালরি সরবরাহ করে।

৩। তাপ নিয়ন্ত্রণ (Heat control) : লিপিড তাপের কুপরিবাহী। তাই প্রাণিদেহের ত্বকের নিচে সঞ্চিত চর্বি দেহের তাপ সংরক্ষণে সহায়তা করে।

৪। গাঠনিক উপাদান (Structural elements) : কোষঝিল্লী ও সকল কোষ অঙ্গাণুর ঝিল্লীর অন্যতম গাঠনিক উপাদান হলো লিপিড।

৫। শোষণ ও পরিবহন (Exploitation and transportation) : লিপিড ফ্যাটি এসিডের শোষণ ও পরিবহনে সাহায্য করে।

৬। হরমোন ও ভিটামিন সংশ্লেষ (Hormone and vitamin synthesis) : অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স গ্রন্থির হরমোন, স্টেরয়েড হরমোন, ভিটামিন-ডি ইত্যাদি কোলেস্টেরল থেকে তৈরি হয়।

৭। সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) : গ্লাইকোলিপিড উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৮। বর্ণ সৃষ্টি (Colour creation) : ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল, ক্লোরোফিল ইত্যাদি লিপিড উদ্ভিদের বর্ণ সৃষ্টি করে এবং শক্তি ধারন করে।

৯। সুগন্ধি সৃষ্টি (The creation of perfume) : টারপিনস জাতীয় লিপিড উদ্ভিদে সুগন্ধি সৃষ্টি করে।

১০। বার্তাবাহক (Messenger) : স্টেরয়েড ও ইকোসানয়েড জাতীয় লিপিড সংকেত পাঠানোর মাধ্যমে দেহের অভ্যন্তরীণ কোষীয় যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১১। আয়নবাহক (Ion carriers) : ফসফোলিপিড কোষের আয়নের বাহক হিসেবেও কাজ করে।

১২। প্রোসথেটিক গ্রুপ (Prosthetic group) : ফসফোলিপিড কতিপয় এনজাইমের প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে কাজ করে।

লিপিড প্রোফাইল (Lipid Profile) : রক্তে কোলেস্টেরল ও চর্বির মাত্রা দেখতে লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষাটি করা হয়। রক্তের লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষায় টোটাল কোলেস্টেরল (TC), লো ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন (LDL), হাই ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন (HDL) ও ট্রাইগ্লিসারাইডের (TG) মাত্রা দেখা হয়। নিচের তালিকা থেকে খুব সহজেই লিপিড প্রোফাইল (mg/dl = miligram/deciliter) সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়।

ব্যখ্যা	TG (mg/dl)	LDL (mg/dl)	HDL (mg/dl)	Total Cholesterol (TC)
স্বাভাবিক মাত্রা	< 150	< 100	> 145	> 200
বর্ডার লাইন মাত্রা	150 – 199	130 - 159	90 – 145	200 – 239
ঝুকিপূর্ণ মাত্রা	200 – 499	160 – 189	< 90	< 240
অতি ঝুকিপূর্ণ মাত্রা	500>	> 190	< 40	< 240
TC = HDL + LDL + 20% of triglyceride level				

কোলেস্টেরল (Cholesterol) : কোলেস্টেরল একটি জটিল মনোহাইড্রিক সেকেন্ডারি অ্যালকোহলিক যৌগ। এটি সাদা, স্ফটিকাকার, পানিতে আর্দ্রবণীয় কিন্তু ইথার, অ্যালকোহল, ক্লোরোফর্ম ইত্যাদি জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়। এটি ফ্যাটি এসিডের সাথে এস্টারিভূত হয়ে মোশ গঠন করে। প্রাণদেহে বেশি ও উদ্ভিদে কম পরিমাণে পাওয়া যায়। আদি কোষের মধ্যে শুধু মাইকোপ্লাজমাতে এটি পাওয়া যায়। চিংড়ি, মাখন, ডিমের কুসুম, যকৃৎ, প্রাণির স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদিতে প্রচুর প্রাণিজ কোলেস্টেরল থাকে। আলু, ওলকচু, মুখীকচু ইত্যাদির ভূনিম্নস্থ অঙ্গেও কোলেস্টেরল পাওয়া যায়। তবে চুপরি আলুতে (*Dioscorea* sp.) প্রচুর উদ্ভিজ্জ কোলেস্টেরল পাওয়া যায়। লোহিত শৈবালেও কোলেস্টেরল পাওয়া যায়। কোলেস্টেরল লিপোপ্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানুষের রক্তে প্রবাহিত হয়।

কোলেস্টেরল প্লাজমামেমব্রেনের প্রবেশ্যতা নিয়ন্ত্রণ করে। কোলেস্টেরল যকৃতে তৈরি হয় এবং প্লাজমামেমব্রেন গঠনে সাহায্য করে ও বিভিন্ন স্টেরয়েড হরমোন (যেমন- টেস্টোস্টেরন) সৃষ্টির সূচনা দ্রব্য হিসেবে কাজ করে। এটি বাইল সল্ট তৈরিতেও সাহায্য করে যা খাদ্য হজমে ভূমিকা রাখে।

মানুষের রক্তে কোলেস্টেরলের স্বাভাবিক মাত্রা 0.15 – 1.20% কিন্তু এর বেশি রক্তনালীর প্রাচীরে কোলেস্টেরল জমা হয়ে করোনারি থ্রম্বোসিস (coronary thrombosis) বা অ্যাথারোস্ক্লেরেসিস (atherosclerosis) নামক মারাত্মক হৃদরোগ সৃষ্টি করে। পিত্তথলির পাথর সৃষ্টিতেও এদের ভূমিকা আছে। কোলেস্টেরল দুই প্রকার, যথা-

১। LDL(Low Density Lipoprotein) : রক্তে LDL সর্বধিক পরিমাণ কোলেস্টেরল বহন করে বলে এদের bad cholesterol বলে।

২। HDL (High Density Lipoprotein) : রক্তে HDL কম পরিমাণে কোলেস্টেরল বহন করে বলে এদের good cholesterol বলে।

রক্তে LDL-এর মাত্রা কম (<100mg/dl) থাকা ভালো, বেশি থাকা ক্ষতিকর। তবে রক্তে HDL এর মাত্রা বেশি (40<mg/dl) থাকা ভালো। স্ত্রীলোকের রক্তে HDL বেশি থাকে এবং LDL কম থাকে। এজন্য স্ত্রীলোকদের পুরুষ অপেক্ষা হৃদরোগ কম হয়।

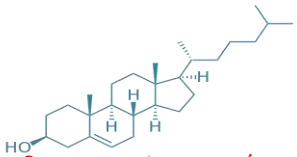

চিত্র : কোলেস্টেরল এর গঠন

ভিন্নধর্মী লিপিড (Heterogeneous lipids) : কিছু লিপিডের রাসায়নিক গঠন ট্রাইগ্লিসারাইড ও ফসফোলিপিড থেকে আলাদা। এদের ভিন্নধর্মী লিপিড বলে, যেমন- ক্যারোটিনয়েড (carotenoids) এবং ভিটামিন (vitamins)।

ক্যারোটিনয়েডস (Carotenoids) : এরা আলোক শোষণকারী অর্গানিক পিগমেন্ট যা ৪টি আইসোপ্রিন একক থেকে উদ্ভুত। প্রায় ৬০০ ধরনের ক্যারোটিনয়েডস আছে, এদের মধ্যে বিটা-ক্যারোটিন হচ্ছে কমলা বর্ণের পিগমেন্ট। এটি আলোকশক্তি শোষণ করে সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করে এবং আলোক অনুধাবন করে ফটোট্রপিজম ঘটায়। গাজরের কমলা ও হলুদ বর্ণ ক্যারোটিনয়েডের জন্য হয়। শরৎকালে পাতার রং কমলা-হলুদ বর্ণের হয় ক্যারোটিনয়েডের কারণে।

ভিটামিন (Vitamins) : ক্যারোটিনয়েডের মতো কতক ভিটামিনও আইসোপ্রিনের রাসায়নিক পরিবর্তন ও সংযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। এগুলো পানিতে আর্দ্রবনীয়। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো-

ভিটামিন-A : এটি ক্যারোটিনয়েড থেকে উৎপন্ন হয়। এর অভাবে রাতকানা ও ত্বক শুস্ক হয় এবং বৃদ্ধি রহিত হয়।

ভিটামিন-D : এটি অন্ত্র কর্তৃক ক্যালসিয়াম শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে। এর অভাবে হাড়জনিত বিভিন্ন রোগ হয়।

ভিটামিন-E : একদল লিপিড ভিটামিন-E হিসেবে পরিচিত। এরা জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার ক্ষতিকর দিক থেকে কোষকে রক্ষা করে।

ভিটামিন-K : সবুজ শাকসবজিতে ভিটামিন-K পওয়া যায়। আন্ত্রিক ব্যাকটেরিয়াও এটি তৈরি করে। এরা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

এনজাইম (Enzyme) : প্রতিটি জীবন্ত জীবকোষে জন্ম থেকে মৃত্যু অবদি নানা প্রকার জৈবনিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে অর্থাৎ জীবন একপ্রকার গতিশীল প্রাণরাসায়নিক অবস্থা। প্রতিটি সজীব কোষে বিপাক ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন প্রকার জৈববস্তুর গঠন, ভাঙ্গন, রুপান্তর ইত্যাদি প্রতিনিয়ত ঘটছে। প্রতিটি প্রক্রিয়ায় একটি জৈববস্তু ধাপে ধাপে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে নানাপ্রকার অন্তবর্তী জৈব যৌগ গঠনের মাধ্যমে অবশেষে উৎপাদিত পদার্থে পরিণত হয়। জীবকোষের এ সকল জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া বিশেষ জৈব যৌগের উপস্থিতিতে ঘটে যা অনুঘটক বা এনজাইম হিসেবে কাজ করে।

সংজ্ঞা (Definition) : সজীব কোষে বিদ্যমান যে প্রোটিন জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিক্রিয়া শেষে রাসায়নিক গঠনে ও ওজনে অপরিবর্তিত থাকে তাকে এনজাইম বা অনুঘটক বা উৎসেচক বলে।

আবিষ্কার (Discovery) : ১৮৩৩ সালে দুজন ফরাসি রসায়নবিদ পায়েন ও পারসোজ (Payen and Persoz) প্রথম amylase এনজাইম আবিষ্কার করেন। কিন্তু এটি প্রায় ৪৫ বছর পরিচিতি লাভ করেনি। ১৮৭৮ সালে জার্মান শারীরতত্ত্ববিদ উইলহেলম কুন (Wilhelm Kuhne) সর্বপ্রথম enzyme শব্দটি ব্যবহার করেন। জার্মান বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড বুচনার (Eduard Buchner) ১৮৯৭ সালে চিনির ফারমেনটেশনের জন্য দায়ী পদার্থকে zymase এনজাইম হিসেবে শনাক্ত করেন। এজন্য তাকে ১৯০৭ সালে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯২৬ সারে জেমস বি সামনার (James B. Sumner) নামক একজন বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম উদ্ভিদকোষ থেকে urease নামক একটি এনজাইমকে স্ফটিকাকারে পৃথক করতে সক্ষম হন। স্ফটিককৃত এ এনজাইমটি প্রোটিনধর্মী বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জীবদেহে খুব স্বল্পমাত্রায় এনজাইম বিদ্যমান থাকে।এনজাইম ব্যতিত দেহের কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় না। হাজার রকমের এনজাইম বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে জীবের জীবন প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখে।

এনজাইমের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of enzyme) :

১। এনজাইম একটি প্রোটিন জাতীয় জৈব রাসায়নিক পদার্থ এবং কোষে সাধারণত কলয়েড (colloid) রূপে থাকে।
২। এরা শুধু জীবিত কোষেই তৈরি হয় এবং কার্যকর হওয়ার পূর্বে এদের পানির প্রয়োজন হয়।
৩। এনজাইম অম্লীয় ও ক্ষারীয় উভয় পরিবেশে ক্রিয়াশীল এবং এদের কাজ একমুখী বা উভমুখী হতে পারে।
৪। কো-এনজাইম, কো-ফ্যাক্টর ইত্যাদির উপস্থিতিতে এর ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।
৫। অধিকাংশ এনজাইম পানি, গ্লিসারল ও লঘু অ্যালকোহলে দ্রবণীয়।
৬। অ্যামোনিয়াম সালফেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড, পিকরিক এসিড ইত্যাদি দ্বারা এনজাইম অধঃক্ষেপিত হয়।
৭। এদের অণু সাবস্ট্রেট অণু অপেক্ষা বড় এবং এদের কার্যকারিতা ত্রিমাত্রিক গঠন দ্বারা নির্ধারিত হয়।
৮। এরা অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং এদের অনুঘটন ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট pH মানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।
৯। এদের বিক্রিয়া উভমুখী, এরা ৩৫-৪০° সে. তাপমাত্রায় বিশেষ কার্যকরী এবং উচ্চ তাপমাত্রায় এর কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।
১০। এরা শুধু বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে এবং বিক্রিয়া শেষে রাসায়নিক গঠনে ও ওজনে অপরিবর্তিত থাকে।
১১। এদের অণু বৃহদাকার এবং উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট হয়।
১২। সব এনজাইমই প্রোটিন জাতীয়, তাই প্রোটিন গঠনকারী অ্যামিনো এসিডই এনজাইমের মূল গাঠনিক উপাদান।

এনজাইমের রাসায়নিক গঠন (Chemical structure of enzyme) : সব এনজাইমই প্রোটিন জাতীয়, তাই প্রোটিন গঠনকারী অ্যামিনো এসিডই এনজাইম সমুহের মূল গাঠনিক উপাদান। একটি সুনির্দিষ্ট এনজাইমের অ্যামিনো এসিড সংখ্যা ও অনুক্রম সুনির্দিষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন এনজাইমের অ্যামিনো এসিডের সংখ্যা ও অনুক্রম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কেবল প্রোটিন দিয়ে গঠিত এনজাইমকে সরল এনজাইম (simple enzyme) বলে। অনেক এনজাইমে প্রোটিনের সাথে কিছু অপ্রোটিন অংশ থাকে। প্রোটিন ও অপ্রোটিন নিয়ে গঠিত এনজাইমকে সংযুক্ত এনজাইম (conjugated enzyme) বলে। সংযুক্ত এনজাইমের প্রোটিন অংশকে অ্যাপোএনজাইম (apoenzyme) এবং অপ্রোটিন অংশকে প্রোস্থেটিক গ্রুপ (prosthetic group) বলে। সংযুক্ত এনজাইমের প্রোস্থেটিক গ্রুপটি ধাতুর অণুতে গঠিত হলে তাকে কো-ফ্যাক্টর (co-factor) এবং জৈব অণুতে গঠিত হলে তাকে কো-এনজাইম (co-enzyme) বলে। অ্যাপোএনজাইম ও কো-ফ্যাক্টর মিলে যে সম্পূর্ণ এনজাইম গঠিত হয় তাকে হলোএনজাইম (holoenzyme) বলে। এনজাইমের যে অংশ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাকে অ্যাকটিভ সাইট (active site) বলে। একটি এনজাইম অণুতে এক বা একাধিক অ্যাকটিভ সাইট থাকতে পারে।

এনজাইমের ক্রিয়ার প্রকৃতি (Nature of Action of the Enzyme) : সাধারণত এনজাইমগুলো ত্রিমাত্রিক গঠনবিশিষ্ট। এনজাইমের প্রোটিন অংশটির ত্রিমাত্রিক গঠনটি বাজ হয়ে এক বা একাধিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য কতকগুলো সুনির্দিষ্ট স্থান তৈরি করে। এ স্থানগুলোকে সক্রিয় স্থান (active site) বলে। এ ছাড়াও অনেক এনজাইমে কতকগুলো নিয়ন্ত্রক স্থান থাকে যেখানে নিয়ন্ত্রক অণুসমূহ এনজাইমকে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে।

প্রতিটি বিপাকীয় প্রক্রিয়া সাধারণত একাধিক ধাপে সম্পন্ন হয় এবং অন্ত :বর্তী প্রতি ধাপে মধ্যবর্তী পদার্থ উৎপন্ন হয়। মধ্যবর্তী পদার্থের অণুগুলো বেশি শক্তি ধারন করে বলে এদের স্থায়িত্ব কম থাকে। পরিবর্তনশীল এ অবস্থাকে অবস্থান্তর অবস্থা (transition state) বলা হয়।একটি বিক্রিয়া সম্পাদানের পূর্বে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বস্তুসমুহকে অবস্থান্তর অবস্থায় পরিবর্তনের জন্য পরিমিত পরিমাণ শক্তি সরবরাহের প্রয়োজন হয়। এ শক্তিকে কার্যকরী শক্তি (activation energy) বলে।কোনো একটি এনজাইম যে জৈব বস্তুর উপর ক্রিয়া করে সেই জৈব বস্তুকে ঐ এনজাইমের সাবস্ট্রেট বলে। সাবস্ট্রেটের উপর এনজাইমের ক্রিয়া দুটি পর্যয়ে সম্পন্ন হয়।

১। প্রথম পর্যায় : প্রতিটি এনজাইমের এক বা একাধিক সক্রিয় স্থান (active site) থাকে। সাবস্ট্রেট অণু এনজাইমের এ সক্রিয় স্থানে সংযুক্ত হয়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ গঠন করে।

২। দ্বিতীয় পর্যায় : এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ ভেঙ্গে গিয়ে এনজাইম অপরিবর্তিত অবস্থায় পৃথক হয়ে যায়। আর রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সাবস্ট্রেট থেকে নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয়।

নিম্নলেখিত দুটি মতবাদ দ্বারা এনজাইমের ক্রিয়ার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা যায়-

(ক) এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ মতবাদ (Enzyme-substrate compound theory) : মাইকেলিস ও মেনটন (Michaelis and Menton, 1913) প্রত্যক্ষ করেন যে, রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় সাবস্ট্রেট অণু আর্দ্র বিশ্লিষ্ট হওয়ার পূর্বে এনজাইমের সাথে যুক্ত হয় এবং বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ হিসেবে এনজাইমের উপরিতল হতে নির্গত হয়। এর উপর ভিত্তি করে তাuরা এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ মতবাদ ব্যক্ত করেন। প্রথম পর্যায়ে এনজাইম (E) সাবস্ট্রেটের (S) সাথে যুক্ত হয়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট (ES) যৌগ গঠন করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এ অন্তবর্তী যৌগ বিশ্লিষ্ট হয়ে বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ (P) সৃষ্টি করে।

চিত্র : এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ মতবাদ

(খ) তালা-চাবি মতবাদ (Lock-key theory) : বিজ্ঞানী Emil Fischer ১৮৯৪ সালে এনজাইমের বিক্রিয়াকে সহজভাবে উপস্থাপন করার জন্য তালা-চাবি মতবাদ প্রদান করেন। Fischer-এর মতে-

১। নির্দিষ্ট তালায় যেমন নির্দিষ্ট চাবি নির্দিষ্ট খাঁজযুক্ত হওয়ায় লাগানো (fit) সম্ভব হয়, তেমনিই নির্দিষ্ট এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট ও সাবস্ট্রেটের মধ্যেই কেবলমাত্র সংযোগ ঘটে।

২। এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইটের আকৃতি অনমনীয় (rigid), নির্দিষ্ট(fixed) এবং সাবস্ট্রেটের সংযোগী অংশের সম্পূর্ণ পরিপূরক (complementary) হয়। যার ফলে এনজাইম ও সাবস্ট্রেট দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়।

৩। এনজাইম ও সাবস্ট্রেট যথাযথ সজ্জাক্রমের (right alignment) মাধ্যমে উভয়ের কাছাকাছি আসে এবং উৎসেচক-সাবস্ট্রেট যৌগ (enzyme-substrate complex বা ES যৌগ) গঠন করে।

৪। অ্যাকটিব সাইটে কতকগুলো বিশেষ অংশ (special group) থাকে (যেমন $-NH_2$, -COOH, -SH প্রভৃতি) যার মাধ্যমে এনজাইম সাবস্ট্রেট অণুর সাথে যুক্ত হয়। তবে একথা মনে রাখতে হবে এনজাইমের রাসায়নিক বিক্রিয়া সবসময়ে এক হয় না, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এনজাইম তার ক্রিয়া পরিচালনার জন্য কো-এনজাইমের সাহায্য নেয়।

চিত্র : তালা-চাবি মতবাদ

এনজাইমের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Enzyme) : উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে এনজাইমের সংখ্যা অনেক। অদ্যবধি সহস্রাধিক এনজাইম শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। গঠন প্রকৃতি ও কী ধরনের বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তার উপর ভিত্তি করে এনজাইমকে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়।

(ক) আণবিক গঠনের ভিত্তিতে (On the basis of molecular structure) : আণবিক গঠন প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে এনজাইমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। সরল এনজাইম (Simple enzyme) : যে এনজাইমের সম্পূর্ণ অংশই শুধু প্রোটিন দিয়ে গঠিত, তাকে সরল এনজাইম বলে। যেমন- সুক্রোজ, অ্যামাইলেজ, অক্সিডেজ ইত্যাদি।

২। সংযুক্ত এনজাইম (Conjugated enzyme) : যে এনজাইমের প্রোটিন অংশের সাথে একটি অপ্রোটিন অংশ যুক্ত থাকে তাকে সংযুক্ত এনজাইম বলে। যেমন- FAD, NAD, ATP, NADH ইত্যাদি।

(খ) ক্রিয়াস্থলের ভিত্তিতে (On a workplace basis) : এনজাইম কোথায় ক্রিয়াশীল হয় তার উপর ভিত্তি করে এনজাইমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। আন্তঃকোষীয় এনজাইম (Intracellular Enzyme) : এসব এনজাইম কোষের অভ্যন্তরে সংশ্লেষিত হয় এবং কাজ করে। যেমন- ক্রেবস চক্রের এনজাইমসমূহ, গ্লাইকোলাইসিসের এনজাইমসমূহ ইত্যাদি।

২। বহিঃকোষীয় এনজাইম (Extracellular Enzyme) : এসব এনজাইম কোষের বাইরে কাজ করে। যেমন- সকল পরিপাক এনজাইম।

(গ) রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকৃতি অনুযায়ী : রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকৃতি অনুযায়ী IUBMB (International Union of Biochemistry and Molecular Biology) এনজাইমের নিম্নলেখিত শ্রেণিবিন্যাস অনুমোদন করেন :

১। অক্সিডোরিডাক্টেজ (Oxidoreductase) : যেসব এনজাইম একটি যৌগের জারণ এবং অপর একটি যৌগের বিজারণ ক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম, তাদেরকে অক্সিডোরিডাক্টেজ এনজাইম বলে। যেমন- অক্সিডেজ, রিডাক্টেজ, ডিহাইড্রোজিনেজ ইত্যাদি।

$$AH + B \quad A + BH \text{ (reduced)}; \longrightarrow A + O \quad AO \text{ (oxidized)}$$

$$\text{সাকসিনিক এসিড} + FAD \xrightarrow{\text{ডিহাইড্রোজিনেজ}} \text{ফিউমারিক এসিড} + FADH_2$$

২। ট্রান্সফারেজ (Transferase) : এধরনের এনজাইম কোনো পদার্থের অণুর একটি কার্যকরি মূলককে অপর একটি পদার্থের অণুতে স্থানান্তরিত করে। এসব কার্যকরি মূলক হলো- মিথাইল, অ্যামিনো, কিটো ধরনের হতে পারে। যেমন- হেক্সোকাইনেজ, ট্রান্সঅ্যামাইলেজ, ডিকার্বোক্সিলেজ ইত্যাদি।

$$AB + C \longrightarrow A + BC$$

$$\text{রাইবুলোজ ৫-ফসফেট} + ATP \xrightarrow{\text{কাইনেজ}} \text{রাইবুলোজ ১, ৫-বিসফসফেট} + ADP$$

৩। হাইড্রোলেজ (Hydrolase) : এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদার্থের বিশেষ বন্ডের সাথে পানির অণু সংযুক্ত করে তাকে হাইড্রোলাইসিস করতে সহায়তা করে। যেমন- এস্টারেজ, সুক্রোজ, নিউক্লিয়েজ ইত্যাদি।

$$AB + H_2O \longrightarrow AOH + BH$$

$$\text{সুক্রোজ} + \text{পানি} \xrightarrow{\text{সুক্রেজ}} \text{গ্লুকোজ} + \text{ফ্রুক্টোজ}$$

৪। লাইয়েজ (Lyase) : এ ধরনের এনজাইম হাইড্রোলাইসিস ও জারণ-বিজারণ ছাড়াই অন্য উপায়ে সাবস্ট্রেটের মূলককে স্থানান্তর করে থাকে। এরা কার্বন-কার্বন, কার্বন-অক্সিজেন, কার্বন-নাইট্রোজেন প্রভৃতি যোজকের উপর কাজ করে। যেমন- অ্যালডোলেজ, আইসোসাইট্রেট ইত্যাদি।

$$RCOCOOH \longrightarrow RCOH + CO_2$$

$$\text{ফ্রুক্টোজ ১, ৬ বিসফসফেট} \xrightarrow{\text{অ্যালডোলেজ}} \text{৩-ফসফোগ্লিসারলডিহাইড} + \text{ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট}$$

৫। আইসোমারেজ (Isomerase) : যে এনজাইমের কার্যকারিতায় কোনো সাবস্ট্রেট থেকে এর আইসোমার উৎপন্ন হয় তাকে আইসোমারেজ এনজাইম বলে। এক্ষেত্রে একটি পদার্থ থেকে অন্য একটি পদার্থ সৃষ্টি হয়। যেমন- ফসফোগ্লুকো আইসোমারেজ।

$$AB \longrightarrow BA$$

$$\text{গ্লুকোজ ৬-ফসফেট} \xrightarrow{\text{ফসফোগ্লুকোআইসোমারেজ}} \text{ফ্রুক্টোজ ৬-ফসফেট}$$

৬। লাইগেজ (Ligase) : যেসব এনজাইম ATP-এর সহায়তায় দুই বা ততোধিক সাবস্ট্রেটকে যুক্ত করে নতুন যৌগ তৈরি করে তাদেরকে লাইগেজ এনজাইম বলে। যেমন- পাইরুভিক কার্বোক্সিলেজ, সিনথেটেজ ইত্যাদি।

$$X + Y + ATP \longrightarrow XY + ADP + Pi$$

$$\text{গ্লুটামিক এসিড} + NH_3 + ATP \xrightarrow{\text{গ্লুটামিক সিন্থেটেজ}} \text{গ্লুটামিন} + ADP + Pi$$

জৈবিক কার্যক্রমে উৎসেচকের ব্যবহার (Use of Enzymes in Biological Activities) :

১। সেলুলোজ (Cellulase) : যে এনজাইম সেলুলোজকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে সেলুবায়োজ উৎপন্ন করে তাকে সেলুলোজ বলে। উদ্ভিদদেহের প্রধান গাঠনিক উপাদান হলো সেলুলোজ। সাধারণত ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং কিছু প্রটোজোয়া সেলুলোজ এনজাইম উৎপাদন করতে পারে। এজন্য মৃত জীবদেহ এসব জীবের ক্রিয়ায় দ্রুত পচে মাটির সাথে মিশে যায়। তৃণভোজী প্রাণির পরিপাকতন্ত্রে বিদ্যমান মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া সেলুলোজ এনজাইম উৎপাদন করে বলে কাঁচা উদ্ভিদ দ্রুত হজম হয়ে যায়। মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রে কোনো সেলুলোজ এনজাইম উৎপন্ন হয় না বলে কাঁচা উদ্ভিদ হজম করতে পারে না।

সেলুলোজ $\xrightarrow{\text{সেলুলেজ}}$ সেলুবায়োজ $\xrightarrow{\text{সেলুবায়েজ}}$ গ্লুকোজ

ব্যবহার : i. কফি প্রক্রিয়াজাতকরণে সেলুলোজ এনজাইম ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। ii. এটি লন্ড্রি ডিটারজেন্ট ও ওয়াশিং পাউডারের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। iii. এটি পেপার এন্ড পাল্প এবং টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত হয়। iv. ঔষধ শিল্পেও এর যথেষ্ট প্রয়োগ রয়েছে। v. বিভিন্ন ধরনের পানীয় ও ফলের জুস উৎপাদনে সেলুলোজ এনজাইমের ব্যবহার রয়েছে।

২। অ্যামাইলেজ (Amylase) : স্টার্চ এর প্রধান উপাদান হলো অ্যামাইলোজ। কোনো কোনো স্টার্চের সবটুকুই অ্যামাইলোজ দিয়ে তৈরি। গ্লুকোজ একক সোজা চেইন-এর পলিমার সৃষ্টি করে স্টার্চ গঠন করে। যে এনজাইম অ্যামাইলোজের ওপর কার্যকর ভূমিকা পালন করে তাকে অ্যামাইলেজ বলে। অ্যামাইলেজ দুধরনের। যথা- আলফা অ্যামাইলেজ ও বিটা অ্যামাইলেজ। আলফা অ্যামাইলেজ সাবস্ট্রেটকে ভেঙ্গে প্রথমে ডেক্সট্রিনে পরিণত করে। বিটা অ্যামাইলেজ পরে ডেক্সট্রিনকে ভেঙ্গে মল্টোজে পরিণত করে।

ব্যবহার : i. স্টার্চ থেকে অ্যালকোহল উৎপাদনে অ্যামাইলেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়। ii. জটিল স্টার্চকে সরল চিনিতে পরিণত করার জন্য পাউরুটি শিল্পে অ্যামাইলেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়। iii. প্যানক্রিয়েটিক এনজাইম রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি (PERT) চিকিৎসায় অ্যামাইলেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়। iv. কাপড় ও বাসনকোসন থেকে স্টার্চ অপসারণের জন্য অ্যামাইলেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৩। প্রোটিয়েজ (Protease) : যেসব এনজাইম প্রোটিওলাইসিস বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে প্রোটিনকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে, তাদের প্রোটিয়েজ বলা হয়। সকল জীবকোষে প্রোটিয়েজ এনজাইম সৃষ্টি হয়। প্রাণির খাদ্য হিসেবে গৃহীত সকল ধরনের প্রোটিন এসব এনজাইমের ক্রিয়ায় পরিপাক হয়ে অ্যামিনো এসিড সৃষ্টি করে, ফলে দেহ গঠিত হয়। উদ্ভিদের বীজে সঞ্চিত প্রোটিন অঙ্কুরোদগমের সময় প্রোটিয়েজ এনজাইমের দ্বারা ভেঙ্গে ভ্রূণে নতুন প্রোটিন তৈরি করে। পেপসিন, ট্রিপসিন, প্যাপেইন ইত্যাদি প্রোটিয়েজ এনজাইম।

ব্যবহার : i. বিভিন্ন শিল্প, ঔষধ তৈরি এবং জীববিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় প্রোটিয়েজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়। ii. পাউরুটির গুণগত মান উন্নয়নে বেকারি শিল্পে এটি ব্যবহৃত হয়। iii. রক্ত তঞ্চন নিয়ন্ত্রণে এক ধরনের প্রোটিয়েজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৪। ক্যাটালেজ (Catalase) : যে এনজাইম হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডকে ভেঙ্গে পানি ও অক্সিজেনে পরিণত করে তাকে ক্যাটালেজ বলে। অক্সিজেন সমৃদ্ধ প্রায় সকল জীবকোষেই ক্যাটালেজ এনজাইম থাকে। এটি জীবকোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম কেননা এর উৎপাদন ক্ষমতা সকল এনজাইমের চেয়ে বেশি। এক অণু ক্যাটালেজ এনজাইম প্রতি সেকেন্ডে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড থেকে কয়েক লক্ষ পানি ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে। pH মান ৭ হলে ক্যাটালেজ এনজাইম মানবদেহে ভাল কাজ করে।

$$2H_2O_2 \xrightarrow{\text{ক্যাটালেজ}} 2H_2O + O_2$$

ব্যবহার : i. পনির তৈরির পূর্বে দুধ থেকে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড অপসারণে দুগ্ধ শিল্পে ক্যাটালেজ এনজাইম ব্যাপক ব্যবহৃত হয়। ii. খাদ্যের জারণ ক্রিয়া রোধ করার জন্য এটি খাদ্যের মোড়কে ব্যবহার করা হয়। iii. কাপড় থেকে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড অপসারণে টেক্সটাইল শিল্পে এটি ব্যবহৃত হয়। iv. চোখের কন্টাক্ট লেন্স পরিষ্কারক হিসেবে ক্যাটালেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৫। জাইমেজ (Zymase) : যে এনজাইম চিনি বা সুক্রোজ শর্করাকে ফারমেনটেশন প্রক্রিয়ায় ইথাইল অ্যালকোহল ও CO_2 এ পরিণত করে তাকে জাইমেজ বলে। ২৫-২৭° সে. তাপমাত্রার মধ্যে এ বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। জার্মান রসায়নবিদ এডওয়ার্ড বুচনার (Eduard Buchner) ১৮৯৭ সালে ঈস্ট জাতীয় ছত্রাক থেকে জাইমেজ এনজাইম আলাদা করেন। এজন্য তাকে ১৯০৭ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। জাইমেজ একটি জটিল ধরনের এনজাইম।

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{জাইমেজ}} 2C_2H_5OH + 2CO_2$$

ব্যবহার : i. ঈস্ট থেকে জাইমেজ এনজাইম সংগ্রহ করে খাদ্যে বদহজম হওয়া রোগীদের ঔষধ হিসেবে দেয়া হয়। ii. বাণিজ্যিকভাবে অ্যালকোহল উৎপাদনে জাইমেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

উৎসেচকের প্রভাবকসমূহ (Enzyme influencers) : নিম্নে উৎসেচকের কার্যকারিতার কয়েকটি প্রভাবক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১। তাপমাত্রা (Temperature) : যে তাপমাত্রায় এনজাইম সর্বাধিক ক্রিয়াশীল থাকে তাকে পরম তাপমাত্রা বলে। অধিকাংশ এনজাইমের কার্যকারিতা ২৫-৪০° সে. এর মধ্যে সর্বোচ্চ থাকে। ০° সে. তাপমাত্রায় অধিকাংশ এনজাইম নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

২। pH : সুনির্দিষ্ট pH মাত্রায় এনজাইম কাজ করে। ক্রিয়াস্থলের pH মানের পরিবর্তন ঘটলে এনজাইম অণুর আয়নিক বৈশিষ্ট্যের রূপান্তরসহ স্বভাবচ্যুতি ঘটে। এতে এনজাইমের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং বিক্রিয়ার গতি মন্থর হয়ে পড়ে।

৩। পানি (Water) : এনজাইমের ক্রিয়ায় পানি একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। পানির পরিমাণ বৃদ্ধিতে এনজাইমের ক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পায়। পানিবিহীন পরিবেশে অধিকাংশ এনজাইম নিষ্ক্রিয় থাকে।

৪। এনজাইমের ঘনত্ব (Density of enzyme) : নির্দিষ্ট পরিমাণ সাবস্ট্রেট ও যৌগকের উপর এনজাইমের ক্রিয়া নির্ভরশীল। ঘনত্ব বৃদ্ধির সাথে সমানুপাতিক হারে এনজাইমের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়।

৫। বিকিরণ (Radiation) : উচ্চশক্তি সম্পন্ন বিকিরণ (যেমন- আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি) এনজাইমের গাঠনিক বিচ্যুতি ঘটায় এবং এদের কার্যক্ষমতা হ্রাস করে।

৬। ধাতু (Metal) : কোনো কোনো ধাতুর উপস্থিতিতে এনজাইমের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, যেমন- Mg^{2+} ও Mn^{2+}। আবার কোনো কোনো ধাতুর উপস্থিতি এনজাইমের কার্যক্রমকে বাধাদান করে, যেমন- Ag, Zn, Cu, Hg ইত্যাদি।

৭। কো-এনজাইম (Co-enzyme) : অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কো-এনজাইমের উপস্থিতিতে এনজাইমের কার্যকারিতা ত্বরান্বিত হয়। যেমন- ATP কো-এনজাইম কাইনেজ এনজাইমের সাথে কাজ করে।

৮। জারণ (Oxidation) : কয়েকটি এনজাইম বিজারণ পদার্থে সক্রিয় হয় এবং মৃদু জারক পদার্থের সংস্পর্শে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। যেমন- সালফাইড্রিল জাতীয় এনজাইম।

ব্যবহারিক জীবনে এনজাইমের গুরুত্ব (Importance of enzymes in practical life) : বর্তমানে বিভিন্ন জৈবনিক কাজে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা হয়। এনজাইমের সহায়তায় প্রস্তুতকৃত বস্তু আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছি। শিল্পকারখানায় বিভিন্ন বস্তু উৎপাদনে এনজাইম ব্যবহৃত হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এসব এনজাইমের ব্যবহার বহুবিধ। নিম্নে বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে এনজাইমের বহুমুখী ব্যবহার উল্লেখ করা হলো-

১। খাদ্য শিল্প (Food industry) : ফলের রসকে স্বচ্ছ করতে পেকটিনেজ ও সেলুলোজ ব্যবহৃত হয়। দুগ্ধ শিল্পে পনির তৈরিতে লাইপেজ ও রেনিন এনজাইম প্রয়োগ করা হয়। শিশু খাদ্যকে সহজপাচ্য করতে ট্রিপসিন ব্যবহার করা হয়। হজম সংশোধনে পেপসিন, অ্যামাইলেজ পেপেইন ইত্যাদি এনজাইম প্রয়োগ করা হয়।

২। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ (Food processing) : বিস্কুট, কর্ণ সিরাপ, কফি প্রক্রিয়াজাত করতে যথাক্রমে প্রোটিয়েজ, অ্যামাইলেজ ও সেলুলোজ ব্যবহৃত হয়।

৩। কাগজ শিল্পে (Paper industry) : কাগজ শিল্পে ব্লিচ করার বিভিন্ন পর্যায়ে উৎকৃষ্ট মানের কাগজ তৈরিতে জাইলোনেজ, লিগনিনেজ, অ্যামাইলেজ, সেলুলোজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

৪। চামড়া শিল্পে (Leather industry) : ট্যানারিতে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় চামড়াকে লোমমুক্ত করতে প্রোটিওলাইটিক এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৫। জমাট রক্ত গলানো (Dissolving blood clots) : মস্তিস্ক ও ধমনীর জমাট রক্ত গলাতে ইউরোবাইলেজ নামক এনজাইমের ব্যবহারে জাপান সফলতা পেয়েছে।

৬। ক্ষত নিরাময়ে (Wound healing) : চামড়ায় সৃষ্ট পোড়া ক্ষত নিরাময়ে এক ধরনের এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৭। রাবার শিল্পে (Rubber industry) : ল্যাটেক্স থেকে রাবার উৎপাদন করার সময় হাইড্রোজেন পার অক্সাইড থেকে অক্সিজেন তৈরি করতে ক্যাটালেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

৮। জৈবিক ডিটারজেন্ট (Biological detergent) : কাপড় থেকে প্রোটিনজাত দাগ তুলতে প্রোটিয়েজ, কাপড় ও বাসনকোসন থেকে স্টার্চের দাগ তুলতে অ্যামাইলেজ এবং কাপড়ের বায়োলজিক্যাল কন্ডিশনার হিসেবে সেলুলোজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

৯। ফটোগ্রাফি শিল্পে (Photographic industry) : ফটোফিল্মের জেলাটিন পরিষ্কার করতে প্রোটিয়েজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

১০। জিন প্রোকৌশলে (Genetic engineering) : কাঙ্খিত DNA কাটতে রেসট্রিকশন এনজাইম এবং জোড়া লাগাতে DNA লাইগেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

১১। চিকিৎসাক্ষেত্র (Medical science) : রক্তের ইউরিয়া ও ইউরিক এসিড নির্ণয়ে ইউরিয়েজ ও ইউরিকেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়। চোখের ছানি অপরেশনে ট্রিপসিন ব্যবহার করা হয়। কৃমিনাশক হিসেবে ফেমিন বা ব্রোমালিন এনজাইম ব্যবহৃত হয়। গ্লুকোমিটারে গ্লুকোজ অক্সিডেজ নামক এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

এনজাইম ও কো-এনজাইম-এর মধ্যে পার্থক্য (The difference between enzymes and co-enzymes) :

পার্থক্যের বিষয়	এনজাইম (Enzymes)	কো-এনজাইম (Co-enzymes)
১। প্রকৃতি	এনজাইম একটি বড় প্রোটিন অণু। অর্থাৎ প্রোটিনধর্মী।	কো-এনজাইম প্রোটিন অণুর একটি অপ্রোটিন অংশ। অর্থাৎ প্রোটিনধর্মী নয়।
২। আণবিক ওজন	এদের আণবিক ওজন ১২০০০-১০০০০০০ ডাল্টন।	এদের আণবিক ওজন খুব কম (৫০০ ডাল্টনের কাছাকাছি)।
৩। কাজ	এটি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে।	এটি প্রোটিন অংশ ছাড়া কাজ করতে পারে না।
৪। তাপের প্রভাব	৫০-৬০°সে. তাপমাত্রায় এদের কার্যকারিত থাকে না। অথাৎ তাপে নষ্ট হয়।	এদের তাপমাত্রা সহন ক্ষমতা অনেক বেশি।
৫। ডায়ালাইসিস	এদের ডায়ালাইসিস করা যায় না।	এদের ডায়ালাইসিস করা যায়।
৬। ভিটামিন	কোনো ভিটামিন এনজাইম হিসেবে কাজ করে না।	অনেক ভিটামিন কো-এনজাইম হিসেবে কাজ করে।
৭। রাসায়নিক বিক্রিয়া	রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় এদের কোনো পরিবর্তন ঘটে না।	রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় এদের পরিবর্তন ঘটতে পারে।
৮। উদাহরণ	প্রোটিয়েজ, লাইপেজ ইত্যাদি।	ATP, NAD, FAD ইত্যাদি।

অ্যামাইলেজ ও অ্যামাইলোপেকটিন-এর মধ্যে পার্থক্য (The difference between amylase and amylopectin) :

পার্থক্যের বিষয়	অ্যামাইলেজ (Amylase)	অ্যামাইলোপেকটিন (Amylopectin)
১। পরিমান	উদ্ভিদের স্টার্চে ২০-৩০%।	উদ্ভিদের স্টার্চে ৭০-৮০%।
২। গঠন	এক অণু অ্যামাইলেজ সাধারণত ২০০-১০০০ α-D গ্লুকোজ অণূ নিয়ে গঠিত।	এক অণু অ্যামাইলেজ সাধারণত ২০০০-২০০০০০ α-D গ্লুকোজ অণূ নিয়ে গঠিত।
৩। লিংকেজ গঠন	এর α-D গ্লুকোজ অণূগুলো পরস্পর α-1, 4 গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজে যুক্ত থাকে।	এর α-D গ্লুকোজ অণূগুলো কার্বনের α-1, 4 লিংকেজ ছাড়াও α-1, 6 গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজে যুক্ত থাকে।
৪। শৃঙ্কলের প্রকৃতি	অশাখান্বিত।	শাখান্বিত।
৫। পানিতে দ্রাব্যতা	দ্রবণীয়।	আর্দ্রবণীয়।
৬। স্টার্চ দ্রবণ + আয়োডিন	কালো বা কালচে-নীল (গাড় নীল) বর্ণের হয়।	লাল বা পার্পেল বর্ণের হয়।

তেল, চর্বি বা ফ্যাট এবং মোম-এর মধ্যে পার্থক্য (The difference between oil, fat and wax) :

তেল (Oil)	চর্বি বা ফ্যাট (Fat)	মোম (Wax)
১। এরা ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলের এস্টার।	এরা ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলের এস্টার।	এরা ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল বাদে অন্য অ্যালকোহলের এস্টার।
২। ২০° সে. তাপমাত্রায় এরা তরল।	২০° সে. তাপমাত্রায় এরা কঠিন বা প্রায় কঠিন।	২০° সে. তাপমাত্রায় এরা কঠিন।
৩। এদের গলনাঙ্ক কম।	এদের গলনাঙ্ক বেশি।	এদের গলনাঙ্ক বেশি।
৪। রাসায়নিকভাবে সক্রিয়।	রাসায়নিকভাবে সক্রিয়।	রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়।
৫। এরা ট্রাইগ্লিসারাইড।	এরা ট্রাইগ্লিসারাইড।	এরা ট্রাইগ্লিসারাইড নয়।
৬। এদের প্রধানত উদ্ভিদের বীজে ও ফলে পাওয়া যায়।	প্রধানত প্রাণিতে পাওয়া যায়।	প্রধানত উদ্ভিদের কিউটিকলে এবং কিছু প্রাণিতে পাওয়া যায়।

❖ **শর্করা (Strach) :** শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট হলো এক প্রকার প্রাকৃতিক জৈব যৌগ যা প্রধানত কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মৌলসমূহ দ্বারা গঠিত এবং যারা আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে কতগুলো হাইড্রোক্সিল গ্রুপযুক্ত অ্যালডিহাইড বা কিটোন উৎপন্ন করে, সেসব যৌগকে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট বলে।

❖ **মনোস্যাকারাইড (Monosaccharide) :** যেসব কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে আর কোনো সরল কার্বোহাইড্রেট একক পাওয়া যায় না, তাদের মনোস্যাকারাইড বলে।

❖ **ডাইস্যাকারাইড (Disaccharide) :** যেসব কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে দুটি মনোস্যাকারাইড একক পাওয়া যায়, তাদের ডাইস্যাকারাইড বলে।

❖ **ইনভার্ট সুগার (Invert sugar) :** গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ এর মিশ্রণকে ইনভার্ট সুগার বলা হয়।

❖ **অলিগোস্যাকারাইড (Oligosaccharide) :** যেসব কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে নির্দিষ্ট সংখ্যেক (৩-১০টি) মনোস্যাকারাইড একক পাওয়া যায় তাদের অলিগোস্যাকারাইড বলে।

❖ **পলিস্যাকারাইড (Polysaccharide) :** যেসব কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে অনেকগুলো (১০ এর অধিক) মনোস্যাকারাইড একক পাওয়া যায়, তাদের পলিস্যাকারাইড বা বহু শর্করা বলে।

❖ **হোমোপলিস্যাকারাইড (Homopolysaccharide) :** যেসব পলিস্যাকারাইড একই রকম মনোস্যাকারাইড সমন্বয়ে তৈরি হয়, তাদের হোমোপলিস্যাকারাইড বা হোমোগ্লাইকান বলে। যেমন- স্টার্চ, সেলুলোজ ইত্যাদি।

❖ **হেটারোপলিস্যাকারাইড (Heteropolysaccharide) :** যেসব পলিস্যাকারাইড একাধিক ধরনের মনোস্যাকারাইড সমন্বয়ে তৈরি হয়, তাদের হেটারোপলিস্যাকারাইড বলে। যেমন- পেকটিন, কাইটিন ইত্যাদি।

❖ **গঠনগত পলিস্যাকারাইড (Structural polysaccharide) :** যেসব পলিস্যাকারাইড কোষের দেহ কাঠামো গঠনে অংশগ্রহণ করে, তাদের গঠনগত পলিস্যাকারাইড বলে।

❖ **সঞ্চিত পলিস্যাকারাইড (Stored polysaccharide) :** যেসব পলিস্যাকারাইড জীবদেহে সঞ্চিত থেকে শক্তি উৎপাদনে এবং জৈব অণু সংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়, তাদের সঞ্চিত পলিস্যাকারাইড বলে। যেমন- স্টার্চ, গ্লাইকোজেন ইত্যাদি।

❖ **গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন (Glycosidic bond) :** একটি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রক্সিল গ্রুপের সঙ্গে অন্য একটি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রক্সিল গ্রুপ যে বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকে তাকে গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন বলে।

❖ **রিডিউসিং সুগার (Reducing sugar) :** যেসব কার্বোহাইড্রেটের অ্যালডিহাইড মূলক ও কিটোন মূলক মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং অন্য যৌগকে বিজারিত করতে পারে, তাদের রিডিউসিং সুগার বা বিজারক শর্করা বলে। যেমন- গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ইত্যাদি।

❖ **নন-রিডিউসিং সুগার (Non-reducing sugars) :** যেসব কার্বোহাইড্রেটের অ্যালডিহাইড মূলক ও কিটোন মূলক মুক্ত অবস্থায় থাকে না এবং অন্য যৌগকে বিজারিত করতে পারে না, তাদের নন-রিডিউসিং সুগার বা অবিজারক শর্করা বলে। যেমন- সুক্রোজ।

❖ **লুব্রিকেন্ট (Lubricant) :** যে পিচ্ছিল জাতীয় পদার্থ দুটি সচল তলের ঘর্ষণ-ক্ষয় কমাতে বা ঘর্ষণরোধে ব্যবহৃত হয় তাকে লুব্রিকেন্ট বলে।

❖ **L-গ্লুকোজ (L-glucose) :** গ্লুকোজের ৫ নং কার্বনে সংযুক্ত OH গ্রুপ যদি বাম দিকে অবস্থান করে তখন তাকে L-গ্লুকোজ বলে।

❖ **D-গ্লুকোজ (D-glucose) :** গ্লুকোজের ৫ নং কার্বনে সংযুক্ত OH গ্রুপ যদি ডান দিকে অবস্থান করে তখন তাকে D-গ্লুকোজ বলে।

❖ **Þ-গ্লুকোজ (Þ-Glucose) :** গ্লুকোজের ১ নং ও ৫ নং কার্বনের মধ্যে অক্সিজেন সেতু তৈরির ফলে ১ নং কার্বনের OH গ্রুপ যদি Þ-অবস্থানে (নিচে) অবস্থান করে তখন তাকে Þ-গ্লুকোজ বলে।

❖ **ß-গ্লুকোজ (ß-Glucose) :** গ্লুকোজের ১ নং ও ৫ নং কার্বনের মধ্যে অক্সিজেন সেতু তৈরির ফলে ১ নং কার্বনের OH গ্রুপ যদি ß-অবস্থানে (উপরে) অবস্থান করে তখন তাকে ß-গ্লুকোজ বলে।

❖ **রাইবোজ (Ribose) :** পেন্টোজ বা পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট শর্করার ২ নং কার্বনে যদি OH গ্রুপ সংযুক্ত থাকে তখন তাকে রাইবোজ বলে।

❖ **এনজাইম (Enzyme) :** যেসব জৈব রাসায়নিক পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত বা হ্রাস করে এবং বিক্রিয়া শেষে রাসায়নিক গঠনে ও ওজনে অপরিবর্তিত থাকে তাদেরকে এনজাইম বলে।

❖ **কো-এনজাইম (Co-enzyme) :** প্রোসথেটিক গ্রুপটি জৈব অণু দ্বারা গঠিত হলে তাকে কো-এনজাইম বলে। যেমন- ADP, ATP, NAD, FAD ইত্যাদি।

❖ **সরল এনজাইম (Simple enzyme) :** যেসব এনজাইম শুধু প্রোটিন দিয়ে গঠিত, তাদের সরল এনজাইম বলে। যেমন- সুক্রোজ, পেপসিন, অ্যামাইলেজ, ট্রিপসিন ইত্যাদি।

❖ **যৌগিক এনজাইম (Compound enzyme) :** যেসব এনজাইমে প্রোটিন অংশের সাথে অপ্রোটিন অংশ যুক্ত থাকে, তাদের যৌগিক এনজাইম বা সংযুক্ত এনজাইম বলে। যেমন- ATP, FAD যুক্ত এনজাইম ইত্যাদি।

❖ **এপিমারেজ (Epimerage) :** যেসব এনজাইম কোনো পদার্থকে এপিমারে পরিণত করে, তাদের এপিমারেজ বলে।

❖ **অ্যাপোএনজাইম (Apoenzyme) :** সংযুক্ত বা কনজুগেটেড প্রোটিন বা এনজাইমের প্রোটিন অংশকে অ্যাপো এনজাইম বলে।

❖ **প্রোসথেটিক গ্রুপ (Prosthetic group) :** সংযুক্ত বা কনজুগেটেড প্রোটিন বা এনজাইমের প্রোটিনবিহীন অংশকে প্রোসথেটিক গ্রুপ বলে।

❖ **হলোএনজাইম (Holoenzyme) :** অ্যাপোএনজাইম ও প্রোসথেটিক গ্রুপকে একত্রে হলোএনজাইম বলে।

❖ **অ্যামিনো এসিড (Amino acid) :** কোনো জৈব এসিডের এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু অ্যামিনো গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপনের ফলে যে জৈব এসিড উৎপন্ন হয় তাকে অ্যামিনো এসিড বলা হয়।

❖ **অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড (Essential amino acid) :** যেসব প্রোটিন মানবদেহে সংশ্লেষিত হতে পারে না কিন্তু বিভিন্ন খাদ্যের সঙ্গে মানুষ এগুলো বাইরে থেকে গ্রহণ করে, তাদের অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড বলে। মানবদেহের জন্য এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

❖ **প্রোটিন অ্যামিনো এসিড (Protein amino acid) :** সাধারণত ২০টি অ্যামিনো এসিড বিভিন্ন প্রোটিন গঠনে অংশগ্রহণ করে। এদেরকে বলা হয় প্রোটিন অ্যামিনো এসিড। যেমন- লিউসিন, লাইসিন, আরজিনিন ইত্যাদি।

❖ **নন-প্রোটিন অ্যামিনো এসিড (Non-protein amino acid) :** যেসব অ্যামিনো এসিড প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে না তাদের নন-প্রোটিন অ্যামিনো এসিড বলে। যেমন- আরনিথিন, সাইট্রলিন, হেমাসেরিন ইত্যাদি।

❖ **ফ্যাটি এসিড (Fatty acid) :** যে জৈব এসিড পানিতে আর্দ্রবণীয় কিন্তু ইথার, ক্লোরোফর্ম, বেনজিন ইত্যদিতে দ্রবণীয় এবং ফ্যাটের আর্দ্র বিশ্লেষণে উৎপন্ন হয়, তাকে ফ্যাটি এসিড বলে।

❖ **পেপটাইড বন্ধন (Peptide bonding) :** একটি অ্যামিনো এসিডের কার্বোক্সিল গ্রুপ অন্য একটি অ্যামিনো এসিডের অ্যামিনো গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়ে যে বন্ধনী গঠন করে তাকে পেপটাইড বন্ধন বলে।

❖ **পলিমার (Polymer) :** কতগুলো যৌগ বা অণুর পুনরাবৃত্তিক সংযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট অপেক্ষাকৃত বৃহৎ যৌগকে পলিমার বলে।

❖ **মনোমার (Manomar) :** যে এককের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পলিমার সৃষ্টি হয় তাকে মনোমার বলে।

❖ **প্রোটিন (Protein) :** প্রোটিন হলো উচ্চ আণবিক ওজন বিশিষ্ট বৃহৎ অণুর জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো এসিড উৎপন্ন করে।

❖ **সরল প্রোটিন (Simple protein) :** যেসব প্রোটিনকে এনজাইম বা এসিড দিয়ে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে শুধু অ্যামিনো এসিড পাওয়া যায়, তাদের সরল প্রোটিন বলে।

❖ **যুগ্ম প্রোটিন বা কনজুগেটেড প্রোটিন (Joint protein or conjugated protein) :** সরল প্রোটিন যখন অপ্রোটিন উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তাকে যুগ্ম প্রোটিন বা কনজুগেটেড প্রোটিন বলে। যেমন- হিমোগ্লোবিন, হিমোসায়ানিন ইত্যাদি ।

❖ **প্রোটিওম (Proteome) :** কোনো কোষ, কলা বা জীব কর্তৃক উৎপাদিত সকল প্রোটিনের সমষ্টিকে প্রোটিওম বলে। একটি জীবের বিভিন্ন কোষ দেহের চাহিদা মতো বিভিন্ন রকম প্রোটিন তৈরি করে থাকে, এমনকি একটি নির্দিষ্ট কোষও বিভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন তৈরি করে।

❖ **লিপিড (Lipid) :** কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সহযোগে গঠিত ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলের এস্টারকে লিপিড বা ফ্যাট বলে।

❖ **সরল লিপিড (Simple lipid) :** যেসব স্নেহপদার্থ কেবল ফ্যাটি এসিড সহযোগে গঠিত হয়, তাদের সরল লিপিড বলে। প্রকৃতপক্ষে, এগুলো ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল বা অ্যালকোহলের অ্যাস্টার।

❖ **যৌগিক লিপিড (Compound lipid) :** সরল লিপিডের সাথে অন্য কোনো অ-লিপিড বা প্রসথেটিক গ্রুপ (জৈব বা অজৈব পদার্থ) সংযুক্ত হয়ে যে লিপিড গঠিত হয়, তাদের যৌগিক লিপিড বলে।

❖ **ফসফোলিপিড (Phospholipid) :** ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল ও ফসফেট সমন্বয়ে গঠিত লিপিডকে ফসফোলিপিড বলে।

❖ **গ্লাইকোলিপিড (Glycolipid) :** ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল ও কার্বোহাইড্রেট সমন্বয়ে গঠিত লিপিডকে গ্লাইকোলিপিড বলে।

❖ **লিপোপ্রোটিন (Lipoprotein) :** লিপিডের সাথে প্রোটিন যুক্ত হয়ে যে জৈব-রাসায়নিক পদার্থ গঠিত হয় তাকে লিপোপ্রোটিন বা প্রোটিনোলিপিড বলে।

❖ **উৎপাদিত লিপিড (Produced lipid) :** সাধারণত সরল বা যৌগিক লিপিডের হাইড্রোলাইসিসের ফলে উৎপন্ন পদার্থকে উৎপাদিত লিপিড বা উদ্ভূত লিপিড বলে। যেমন- স্টেরয়েড, রাবার ইত্যাদি।

❖ **লিপিড প্রোফাইল (Lipid profile) :** রক্তে কোলেস্টেরল ও চর্বির মাত্রা দেখতে যে পরীক্ষাটি করা হয় তাকে লিপিড প্রোফাইল বলে। রক্তের লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষায় Total Cholesterol (TC), LDL, HDL ও Triglyceride (TG)-এর মাত্রা দেখা হয়।

❖ **এলডিএল (LDL) :** LDL-এর পূর্ণরুপ হলো Low Density Lipoproteins। রক্তে LDL সর্বাধিক পরিমাণ কোলেস্টরল বহন করে বলে এদের bad cholesterol বলে। রক্তে LDL-এর মাত্রা (<100mg/dl) থাকা ভালো, বেশি থাকা ক্ষতিকর।

❖ **এইচডিএল (HDL) :** HDL-এর পূর্ণরুপ হলো High Density Lipoproteins। রক্তে HDL পরিমান কোলেস্টেরল বহন করে বলে এদের good cholesterol বলে।তবে রক্তে HDL এর মাত্রা বেশি (40<mg/dl) থাকা ভালো। স্ত্রীলোকের রক্তে HDL বেশি থাকে এবং LDL কম থাকে। এজন্য স্ত্রীলোকদের পুরুষ অপেক্ষা হৃদরোগ কম হয়।

❖ **অ্যাস্টার (Aster) :** জৈব এসিড ও অ্যালকোহলের বিক্রিয়ায় যে লবণ উৎপন্ন হয় তাকে অ্যাস্টার বলে।

❖ **গ্লিসারল (Glycerol) :** গ্লিসারল হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র অণুর অ্যালকোহল।

❖ **পিএইচ (pH) :** হাইড্রোজেন-আয়ন গাঢ়ত্বের পরিমাপকে pH বলে। এটি মূলত অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের পরিমাপ বুঝায়।

❖ **সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড (Saturated fatty acid) :** ফ্যাটি এসিডের সকল কার্বন-কার্বন বন্ধন যদি একক বন্ধন হয় তবে সেই ফ্যাটি এসিডকে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড বা স্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড বলে।

❖ **অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড (Unsaturated fatty acid) :** ফ্যাটি এসিডের কার্বন-কার্বন বন্ধনের কোনো একটি যদি দ্বি-বন্ধন বা ত্রি-বন্ধন হয় তবে সেই ফ্যাটি এসিডকে অস্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড বা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটিএসিড বলে।

❖ **সাবস্ট্রেট (Substrate) :** এনজাইম যেসব পদার্থের উপর ক্রিয়া করে তাদের বিক্রিয়ক বা সাবস্ট্রেট বলে।

❖ **অ্যাকটিভ সাইট (Active site) :** এনজাইমের কিছু নির্দিষ্ট স্থান থাকে যেখানে সাবস্ট্রেট অণু যুক্ত হয়। এসব স্থানকে অ্যাকটিভ সাইট বলে।

❖ **কার্যকরী শক্তি (Effective energy) :** যেকোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন করতে কিছুটা অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয়। এই অতিরিক্ত শক্তিকে কার্যকরী শক্তি বলে।

❖ **এনজাইমোলজি (Enzymology) :** এনজাইম বিষয়ক অধ্যায়নকে এনজাইমোলজি বলে।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন (Knowledge Based Questions)

১। ফসফোলিপিড কী?
২। এনজাইম কী?
৩। পলিস্যাকারাইড কী?
৪। লিপিড কী?
৫। মিশ্র যৌগ কী?
৬। যুগ্ম প্রোটিন কী?
৭। রিডিউসিং স্যুগার কাকে বলে?
৮। নন-রিডিউসিং স্যুগার কাকে বলে?
৯। গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ কাকে বলে?
১০। প্রোটিন কী?
১১। কো-ফ্যাক্টর কী?
১২। প্রোস্থেটিক গ্রুপ কাকে বলে?
১৩। অ্যাপোএনজাইম কাকে বলে?
১৪। কো-এনজাইম কী?
১৫। সম্পূর্ণ প্রোটিন কী?
১৬। পেপটাইড বন্ধন কী?
১৭। মনোস্যাকারাইড কী?
১৮। স্টার্চ কী?
১৯। সেলুলোজ কী?
২০। মোম কী?
২১। অ্যামিনো এসিড কী?
২২। কনজুগেটেড এনজাইম কী?
২৩। জৈব অণু বা বায়োমলিকিউল কী?
২৪। কার্বোহাইড্রেট কী?
২৫। পলিস্যাকারাইড কাকে বলে?
২৬। গ্লুকোজের রিং স্ট্রাচার দেখাও?
২৭। ইনভার্ট স্যুগার কী?
২৮। গ্লোবিউলার প্রোটিন কী?
২৯। লিপিড কী?
৩০। এস্টার কী?
৩১। ফ্যাটি এসিড কী?
৩২। স্নেহদ্রব্য বা ট্রাইগ্লিসারাইড কী?
৩৩। লিপোপ্রোটিন কী?
৩৪। লিপিড প্রোফাইল কী?
৩৫। হলোএনজাইম কী?
৩৬। সাবস্ট্রেট কী?
৩৭। এপিমারেজ কাকে বলে?
৩৮। সরল এনজাইম কাকে বলে?
৩৯। দুটি টেট্রোজ শর্করার উদাহরণ দাও?
৪০। দুটি নন-রিডিউসিং শর্করার উদাহরণ দাও?
৪১। চামড়া শিল্পে কোন এনজাইম ব্যবহৃত হয়?
৪২। L গ্লুকোজ কী?
৪৩। D গ্লুকোজ কী?
৪৪। অ্যাকটিভ সাইট কী?
৪৫। পলিমার কী?

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন (Comprehension Based Questions)

১। কোলেস্টেরল বলতে কী বুঝ?
২। এনজাইমের তালাচাবি মতবাদ বলতে কী বুঝ?
৩। লিপিডের বৈশিষ্ট্য লিখ?
৪। মানুষ সেলুলোজ হজম করতে পারে না কেন?
৫। লিপিডের উৎস উল্লেখ কর?
৬। চর্বি ও তেল বলতে কী বুঝ?
৭। প্রোটিনকে অ্যাম্ফিটারিক অণু বলে কেন?
৮। রাইবোজ ও ডিঅক্সিরাইবোজ স্যুগারের মধ্যে পার্থক্য কী?
৯। গ্লুকোজকে কেন মনোস্যাকারাইড বলা হয়?
১০। রেস্ট্রিকশন এনজাইম বলতে কী বুঝ?
১১। কার্বোহাইড্রেটের বৈশিষ্ট্য লিখ?
১২। প্রোটিনের বৈশিষ্ট্য লিখ?
১৩। লিপিড প্রোফাইল বলতে কী বোঝায়?
১৪। কীভাবে পেপটাইড বন্ড সৃষ্টি হয়?
১৫। অ্যালডোস্যুগার ও কিটোস্যুগার বলতে কী বুঝ?
১৬। গ্লুকোজের বৈশিষ্ট্য লিখ?
১৭। গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন বলতে কী বুঝ?
১৮। স্ট্রার্চ এর রিং স্ট্রাকচার দেখাও?
১৯। সুক্রোজকে কেন নন-রিডিউসিং স্যুগার বলা হয়?
২০। স্ট্রার্চ একটি পলিস্যাকারাইড যৌগ কেন?
২১। দুটি সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের উদাহরণ দাও?
২২। স্টেরয়েড ও স্টেরল বলতে কী বুঝ?
২৩। মহিলাদের হৃদ রোগ কম হয় কেন?
২৪। অ্যামিনো এসিডের বৈশিষ্ট্য লিখ?
২৫। কো-এনজাইম বলতে কী বুঝ?
২৬। প্রোটিনকে জীবনের ভাষা বলা হয় কেন?
২৭। কোলেস্টেরল বলতে কী বুঝ?
২৮। উদ্ভিদদেহের শুস্ক ওজনের কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কত?
২৯। অ্যালডিহাইডকে রিডিউসিং গ্রুপ বলা হয় কেন?
৩০। এনজাইম সম্পর্কিত Emil Fisher-এর মতবাদটি ব্যাখ্যা কর?
৩১। সংযুক্ত এনজাইম বলতে কী বোঝায়?
৩২। সেলোবায়োজ বলতে কী বোঝায়?
৩৩। সুক্রোজের স্ফটিক কীভাবে পাওয়া যায় ব্যাখ্যা কর?
৩৪। জীবের জীবনে প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ কেন?
৩৫। জিন প্রোকৌশলে কোন এনজাইম ব্যবহৃত হয়?
৩৬। অ্যামাইলেজ এনজাইমের ২টি ব্যবহার লিখ?
৩৭। রাসায়নিক গঠন অণুর ভিত্তিতে মনোস্যাকারাইড কয় প্রকার?
৩৮। সুক্রোজের ২টি ব্যাবহার লিখ?
৩৯। গ্লাইকোজেনের সাধারণ রাসায়নিক সংকেতটি লিখ?
৪০। LDL ও HDL বলতে কী বুঝ?

পার্থক্য লিখ :

৪১। রাইবোজ ও ডিঅক্সিরাইবোজ
৪২। গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ
৪৩। স্টার্চ ও সেলুলোজ
৪৪। অ্যামাইলেজ ও অ্যামাইলোপেকটিন
৪৫। এনজাইম ও কো-এনজাইম

১। মি. X বৈজ্ঞানিক দ্রব্যাদির দোকান হতে A ও B রাসায়নিক পদার্থ সমৃদ্ধ দুটি প্যাকেট কিনলেন। A ও B প্যাকেটে প্রাপ্ত বস্তুতে রাসায়নিক পদার্থ যথাক্রমে ৬-কার্বন বিশিষ্ট অ্যালডোজ এবং কিটোজ সুগার। পদার্থ দুটি পরস্পর আইসোমার হলেও প্রথমটি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় এবং দ্বিতীয়টি সরাসরি উৎপন্ন হয় না।

(ক) লিপিড কাকে বলে? ১

(খ) 'সকল এনজাইমই প্রোটিন কিন্তু সকল প্রোটিন এনজাইম নয়'- কেন? ২

(গ) A ও B প্যাকেটের বস্তুতে প্রাপ্ত রাসায়নিক পদার্থের গাঠনিক সংকেতসহ বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থটি কিভাবে তৈরি হয় তা সরল বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্লেষণ কর। ৪

২। A ও B উভয়েই যথাক্রমে ৫ ও ৬ কার্বন বিশিষ্ট মনোস্যাকারাইড যারা জীবজগতের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য।

(ক) পেপটাইড বন্ধন কী? ১

(খ)এনজাইমের তালাটাবি মতবাদ বলতে কী বুঝ? ২

(গ) দেখাও যে, B এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান গঠনে অংশগ্রহণ করে- ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) A ছাড়া জীবজগতের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না।-তোমার মতামত দাও। ৪

৩। চিত্রটি ভালভাবে লক্ষ্য কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

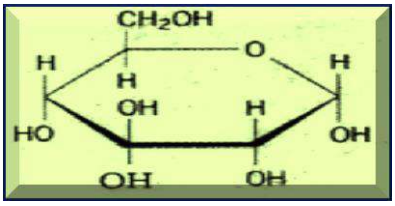

(ক) ইনভার্ট স্যুগার কী? ১

(খ) জীবের জীবনে প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

(গ) উক্ত যৌগটি যে জৈব যৌগের অন্তর্ভূক্ত গঠন অনুসারে তার শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উল্লিখিত জৈব যৌগটি উদ্ভিদ দেহে উৎপাদিত না হলে জীবের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়তো বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। আদনান শরীর গঠন ও মনকে প্রফুল্ল রাখার জন্য নিয়মিত খেলাধুলা করে। খেলা শেষে প্রচন্ড ক্লান্ত অবস্থায় বাসায় ফিরলে মা তাকে চিনির শরবত বানিয়ে দিলেন। আদনান জানে চিনি এমন এক উপাদান যা ভেঙে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দেয় এবং দেহকে সতেজ রাখে।

(ক) D গ্লুকোজ কী? ১

(খ) মানুষ সেলুলোজ হজম করতে পারে না কিন্তু গবাদিপশু পারে কেনো? ২

(গ) আলোচিত উপাদানটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উপাদানটিকে পলিস্যাকারাইড বলা যায় কী? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। নিচের চিত্র লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

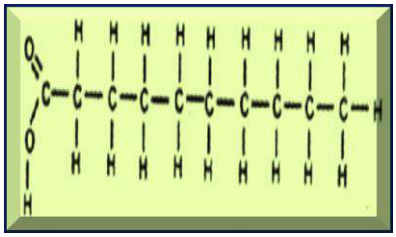

(ক) যুগ্ম প্রোটিন কী? ১

(খ) লিপিডের বৈশিষ্ট্য লিখ? ২

(গ) উদ্দিপকে পদার্থটির মানবদেহের স্বাস্থ্যগত প্রোফাইল তৈরি কর। ৩

(ঘ) উদ্দিপকে উল্লিখিত উপাদানের জৈবিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

৬। A হলো জীবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদার্থ। একে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে অ্যামিনো এসিড পাওয়া যায়। আবার B হলো আরেকটি যৌগ যা কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সমন্বয়ে গঠিত এবং এর অনুপাত ১ :২ :১।

(ক) মনোস্যাকারাইড কী? ১

(খ) কীভাবে পেপটাইড বন্ড সৃষ্টি হয়? ২

(গ) A এর গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) A এবং B জীবদেহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে- উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। আমরা যে চিনি খাই তা ভেঙ্গে শরীরে শক্তি উৎপন্ন হয়। সেই শক্তি দিয়ে আমরা জীবন নির্বাহ করি।

(ক) কার্বোহাইড্রেট কী? ১

(খ) স্টার্চ এর রিং স্ট্রাকচার দেখাও? ২

(গ) উদ্দীপকের উপাদানটির গাঠনিক সংকেত লিখ। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের যৌগটির গাঠনিক একগুলো উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে- বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। রহিম সকালে নাস্তায় আলুভাজি ও রুটি খেয়ে টিস্যুপেপার দিয়ে হাত মুছে কলেজে এলো।

(ক) কোন লিপিড রক্ত জমাট বাঁধতে সাহয্য করে? ১

(খ) দুটি কো-এনজাইমের পূর্ণ নাম লিখ? ২

(গ) রহিমের নাস্তায় কী ধরনের জৈববস্তু আছে তার নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ। ৩

(ঘ) যে জৈববস্তু দ্বারা টিস্যুপেপার তৈরি তার সাথে রহিমের নাস্তার কী সম্পর্ক আছে, যুক্তি দ্বারা বোঝাও। ৪

৯। A ও B জীবদেহে বিদ্যমান দুইটি জৈব রাসায়নিক বস্তু। A যৌগের গাঠনিক একক অ্যামাইনো এসিড। B যৌগটি জীবদেহের জৈব রাসয়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবকের ভুমিকা পালন করো।

(ক) ইনভাট স্যুগার কী? ১

(খ) লিপিডের কাজ লিখ? ২

(গ) উদ্দীপকের B যৌগটির ক্রিয়াকৌশল ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) আমাদের খাদ্য তালিকায় A যৌগের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে মতামদ উপস্থাপন কর। ৪

১০।

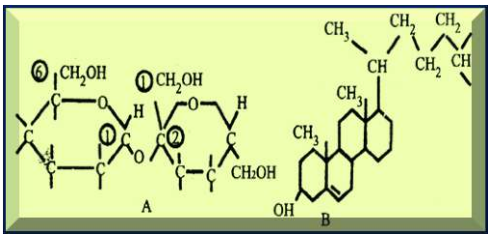

(ক) গ্লোবিউলার প্রোটিন কী? ১
(খ) স্ট্রার্চ একটি পলিস্যাকারাইড যৌগ কেন? ২
(গ) উদ্দীপকে A অণুটির সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৩
(ঘ) জীবদেহে উদ্দীপকে উল্লিখিত B অণুর ভূমিকা বিশ্লেষণ করে মতামত দাও। ৪

১১। রমজান মাসে ইফতারে সবাই চিনির সরবত ও তেলে ভাজা নানা ধরনের মুখরোচক খাবার খেতে পছন্দ করে।
(ক) পলিস্যাকারাইড কাকে বলে? ১
(খ) লাইসোজোমকে আঘাতী বলা হয় কেন? ২
(গ) সরবতে মিষ্টি প্রদানকারী উপাদানের রাসায়নিক গঠন লিখ। ৩
(ঘ) মুখরোচক খাবার তৈরিতে উদ্দীপকের উল্লিখিত উপাদানটি মানবদেহের ক্ষতিকারক দিক বিশ্লেষণ কর। ৪

১২। ভিন্ন রিং স্ট্রাকচারবিশিষ্ট্য একটি মনোস্যাকারাইড শৃঙ্খলিত হয়ে বিভিন্ন পলিস্যাকারাইড তৈরি করে। এদের মধ্যে একটি উদ্ভিদের সঞ্চিত পদার্থ এবং অন্যটি গাঠনিক পদার্থ হিসেবে থাকে।
[রাজশাহী বোর্ড - ২০১৭]
(ক) পেপটাইড বন্ধনী কী? ১
(খ) এনজাইমের তালা-চাবি মতবাদ বলতে কী বুঝ? ২
(গ) উল্লেখিত মনোস্যাকারাইডটির বৈশিষ্ট্য লিখ। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত পলিস্যাকারাইড দুটি গঠনগতভাবে ভিন্ন- ব্যাখ্যা কর। ৪

১৩। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

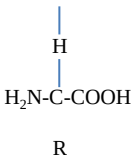

(ক) কার্বোহাইড্রেট কী? ১
(খ) সুক্রোজকে অবিজারক শর্করা বলা হয কেন? ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত যৌগটির বৈশিষ্ট্য লিখ। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত যৌগটি প্রোটিনের গাঠনিক একক- ব্যাখ্যা প্রদান কর। ৪

১৪। জীববিজ্ঞানের শিক্ষক মো. আমজাদ হোসেন শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় একদিন দুটি পলিস্যাকারাইড সম্পর্কে পাঠদান দিতে গিয়ে বললেন- একটি উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে বিরাজ করে এবং অন্যটি উচ্চ শ্রেণির প্রাণিদেহে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে থাকে।
(ক) পলিমার কী? ১
(খ) গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ এর মধ্যে পার্থক্য লিখ? ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রথম পলিস্যাকারাইডটির গঠন বিশ্লেষণ কর? ৩
(ঘ) উদ্দীপকে আলোচিত পলিস্যাকারাইড দুটির মধ্যে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ- তোমার মতামত প্রদান কর। ৪

১৫। জেরিন ছোটবেলা থেকে আঙ্গুর খেতে খুব পছন্দ করে। সে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, আঙ্গুর এত মিষ্টি হয় কেন? তার বাবা বললেন, এতে এক ধরনের স্যুগার জমা হয়ে এত মিষ্টি হয়। এ স্যুগারটি মধুতেও মুক্ত অবস্থায় বিরাজ করে করে বলে মধুও এত মিষ্টি হয়। এর অন্য একটি নাম হলো ডেক্সট্রোজ।
(ক) অ্যাপোএনজাইম কী? ১
(খ) গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ কাকে বলে? ২
(গ) জেরিনের বাবা যে স্যুগারের কথা বলেছিলেন তা কিভাবে গবেষণাগারে তৈরি করা যায়- ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে নির্দেশিত স্যুগারটি ভিন্ন ভিন্ন রিং স্ট্রাকচার প্রদর্শন করে- ব্যাখ্যা কর। ৪

১৬। লুনা আজ সকালে চালের আটার রুটি, আলুভাজি ও কলা দিয়ে নাস্তা করল এবং নাস্তা করার পর এক গ্লাস দুধও পান করল। বাড়ীতে মেহমান আসবে বলে রাতের খাবারের জন্য তার মা মোরগ পোলাও, গরুর মাংস এবং ডিম রান্না করল।
(ক) স্নেহদ্রব্য বা ট্রাইগ্লিসারাইড কী? ১
(খ) কোলেস্টেরল বলতে কী বুঝ? ২
(গ) লুনা সকালের নাস্তায় যেসব খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করলো তাতে কী কী ধরনের জৈব-রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) খাদ্যের গুণাবলীর ভিত্তিতে লুনার কোন সময়ের খাদ্য অধিক স্বাস্থ্যসম্মত-বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭। উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদের দেহে বিভিন্ন ধরনের জৈব-রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়, যেমন- কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, প্রোটিন এবং এনজাইম। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও জননের জন্য এই পদার্থগুলো খুবই প্রয়োজনীয়। রাসায়নিকভাবে সকল এনজাইমই প্রোটিন কিন্তু সকল প্রোটিন এনজাইম নয়।
(ক) চামড়া শিল্পে কোন এনজাইম ব্যবহৃত হয়? ১
(খ) প্রোটিনকে জীবনের ভাষা বলা হয় কেন? ২
(গ) উদ্বিদের দেহ গঠনে উদ্দীপকের প্রথম তিনটি পদার্থের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) আলোচিত উদ্দীপকের সর্বশেষ বাক্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮। জীবদেহে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া চলতে থাকে আর এ ধরনের বিক্রিয়াগুলি বিভিন্ন ধরনের এনজাইম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই এনজাইমগুলি একটি জৈব যৌগ দ্বারা গঠিত এবং বিক্রিয়াগুলিকে হ্রাস বা বৃদ্ধি করে বিক্রিয়া শেষে নিজেরা অপরিবর্তিত থাকে।
(ক) সরল এনজাইম কাকে বলে? ১
(খ) অ্যামাইলেজ এনজাইমের ২টি ব্যবহার লিখ? ২
(গ) উদ্দীপকের জৈব যৌগটি সাধারণত যে যৌগ দ্বারা গঠিত সেই যৌগের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) আলোচিত উদ্দীপকের জৈব যৌগটির উদাহরণসহ শ্রেণিবিভাগ এবং এর ক্রিয়াকৌশল বিশ্লেষণ কর। ৪

অনুশীলনী-৩ : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
{EXERCISE-3 : MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (MCQ)}

১। কোনটি মনোস্যাকারাইড? *[ঢা. বো. '১৯]*
(ক) রাইবোজ (খ) মল্টোজ
(গ) সেলোবায়োজ (ঘ) সুক্রোজ

২। কোলেস্টেরল কোন জাতীয় পদার্থ? *[সি. বো. '১৯]*
(ক) কার্বোহাইড্রেট (খ) প্রোটিন
(গ) লিপিড (ঘ) ভিটামিন

৩। তুলসি, পুদিনা ও পাইন উদ্ভিদ থেকে কোন লিপিড পাওয়া যায়? *[সি. বো. '১৭]*
(ক) টারপিনস (খ) কোলেস্টেবল
(গ) ফসফোলিপিড (ঘ) গ্লিসারয়েড

৪। ধানের আরইজিন কোন ধরনের প্রোটিন? *[ঢা. বো. '১৬]*
(ক) গ্লোবিউলিন (খ) গ্লুটেলিন
(গ) প্রোলামিন (ঘ) প্রোটামিন

📖 উদ্দীপকের আলোকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

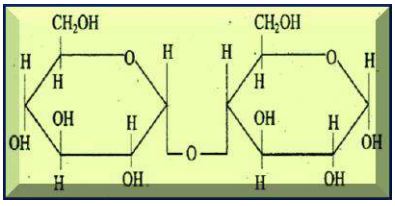

৫। উদ্দীপকের যৌগটির নাম কী? *[রা. বো. '১৯]*
(ক) সেলুলোজ (খ) সুক্রোজ
(গ) মল্টোজ (ঘ) সেলোবায়োজ

৬। উদ্দীপকের যৌগ- *[রা. বো. '১৯]*
i. α-D glucose দ্বারা গঠিত
ii. আংশিক বিজারণক্ষম
iii. β-১, ৪ গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনযুক্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii*
(গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

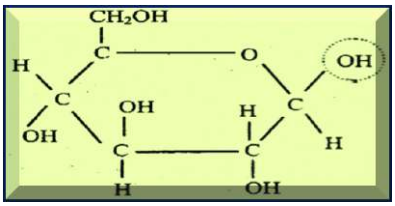

📖 নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৭। উদ্দীপকের প্রদর্শিত অণুটি- *[রা. বো. '১৭]*
i. পানিতে দ্রবণীয়
ii. কিটোজ সুগার
iii. রিডিউসিং সুগার
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii*
(গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

৮। এনজাইমের প্রকৃতি কিরূপ? *[ঢা. বো. '১৭]*
ক. কলয়েড (খ) কঠিন
(গ) তরল (ঘ) স্ফটিক

O OH OH
৯। H - C - CH - CH_2 যৌগটির নাম কী?
(ক) গ্লিসারডিহাইড (খ) রাইবোজ
(গ) ইরথ্রোজ (ঘ) গ্যালাকটোজ

১০। কোন জৈব যৌগটি জীবমন্ডলে সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়?
(ক) সেলুলোজ (খ) স্টার্চ
(গ) গ্লাইকোজেন (ঘ) ইউরিক অ্যাসিড

১১। কোনটিতে কিটো (>C = O) গ্রুপ থাকে? *[ব. বো. '১৫]*
(ক) ফ্রুক্টোজ (খ) রাইবোজ
(গ) গ্লুকোজ (ঘ) ইরিথ্রোজ

১২। DNA-তে সংরক্ষিত বংশগতির তথ্য কোনটি সংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়?
(ক) কার্বোহাইড্রেট (খ) স্টার্চ
(গ) সেলুলোজ (ঘ) প্রোটিন

১৩। গ্লিসারল, ফ্যাটি অ্যাসিড ও ফসফেটের সমন্বয়ে গঠিত লিপিডকে কী বলে?
(ক) ট্রাইগ্লিসারাইড (খ) ফসফোলিপিড
(গ) গ্লাইকোলিপিড (ঘ) টারপিনয়েড

১৪। প্রোটিনের প্রোসথেটিক গ্রুপ Mg^{2+} হলে তাকে কী বলে?
(ক) কোএনজাইম (খ) কোফ্যাক্টর
(গ) অ্যাপোএনজাইম (ঘ) হলোএনজাইম

১৫। গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনে তৈরি হয়- *[দি. বো. '১৭]*
i. ডাইস্যাকারাইড
ii. অলিগোস্যাকারাইড
iii. পলিস্যাকারাইড
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii*
(গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

১৬। $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow A + B$; বিক্রিয়াটির উৎপন্ন পদার্থগুলো উভয়েই-
i. মনোস্যাকারাইড
ii. পানিতে দ্রবণীয়
iii. মুক্ত মূলক উপস্থিত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii*
(গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

📖 মোহন পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারে- চাল, গম, ভুট্টা, আলু ইত্যাদি খাদ্য পরিপাকে সরল উপাদানে বিভক্ত হয় যা পরবর্তীতে দেহকোষে জারিত হয়ে দেহের প্রয়োজনীয় শক্তি সরবাহ করে।

১৭। উদ্দীপকের খাদ্য উপাদান বিশ্লেষণ করলে ক্রমান্বয়ে যেসব পদার্থ পাওয়া যায়- *[চ. বো. '১৬]*
(ক) স্টার্চ - মলটোজ - ডেক্সট্রিন - গ্লুকোজ
(খ) স্টার্চ - ডেক্সটিন্ - মলটোজ - গ্লুকোজ
(গ) স্টার্চ - মলটোজ - গ্লুকোজ - ডেক্সট্রিন
(ঘ) স্টার্চ - গ্লুকোজ - ডেক্সট্রিন - মলটোজ

১৮. কোনটি অ্যালকোহলে দ্রবীভূত হয়? *[সি. বো. '১৫]*
(ক) প্রোটামিন (খ) প্রোলামিন
(গ) গ্লোবিউলিন (ঘ) গ্লুটোলিন

📖 নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রিফাত বিজ্ঞান পত্রিকা পড়ে জানলো যে প্রাণিদের সঞ্চিত খাদ্য উপাদানকে হাইড্রোলাইসিস করে একটি যৌগ পাওয়া যায় যা দেখতে পাউডার জাতীয় ও পানিতে দ্রবনীয়।

১৯। যৌগটি আয়োডিন দ্রবণে কী বর্ণ দেয়?
(ক) লাল (খ) নীল
(গ) সবুজ (ঘ) হলুদ

২০। উল্লিখিত যৌগটির-
i. অ্যামাইলোপেকটিনের গ্লুকোজ অণু ১-৪ বন্ধনে যুক্ত হয়
ii. গ্লুকোজ অণু α-১-৬ বন্ধনে যুক্ত হয়
iii. অ্যামাইলোজের গ্লুকোজ অণু ১-২ বন্ধনে যুক্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii*
(গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

২১। ডিমের সাদা অংশে কোন জাতীয় প্রোটিন পাওয়া যায়? *[য. বো. '১৫]*
(ক) অ্যালবুমিন (খ) গ্লোবিউলিন
(গ) গ্লুটোলিন (ঘ) প্রোলামিন

২২। কোন বিজ্ঞানী তালা-চাবি মতবাদ প্রদান করেন? *[চ. বো. '১৫]*
(ক) Emil Fisher (খ) D. Koshland
(গ) Diener (ঘ) D. Morgan

২৩। কোনটি ফসফোলিপিডের উদাহরণ? *[চ. বো. '১৯]*
(ক) লেসিথিন (খ) সুবেরিন
(গ) কিউটিন (ঘ) টারবিন

২৪। প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে কোন অঙ্গাণু? *[কু. বো. '১৫]*
(ক) মাইট্রোকন্ড্রিয়া (খ) রাইবোজোম
(গ) লাইসোজোম (ঘ) সেন্ট্রিওল

২৫। হিমোগ্লোবিন হলো- *[রা. বো. '১৫]*
(ক) যুগ্ম প্রোটিন (খ) ফসফোলিপিড
(গ) এনজাইম (ঘ) কোলেস্টেরল

২৬। নিচের কোনটি লিপিড পরিপাককারী এনজাইম? *[দি. বো. '১৬]*
(ক) ইনভারটেজ (খ) সেলুলোজ
(গ) লাইপেজ (ঘ) সুক্রোজ

২৭। ধানের অরাইজিন কোন ধরনের প্রোটিন? *[চ. বো. '১৬]*
(ক) গ্লোবিউলিন (খ) গ্লুটেলিন
(গ) প্রোলামিন (ঘ) প্লোটামিন

২৮। এনজাইমের প্রকৃতি কিরুপ? *[ঢা. বো. '১৭]*
(ক) কলয়েড (খ) কঠিন
(গ) তরল (ঘ) স্ফটিক

২৯। কোনটি ইক্ষু ও বীটের চিনি নামে পরিচিত? *[সি. বো. '১৭]*
(ক) মল্টোজ (খ) সুক্রোজ
(গ) গ্লুকোজ (ঘ) ফ্রুকটোজ

৩০। নিচের কোনটি উদ্ভিদে উৎপাদিত প্রথম যৌগ? *[রা. বো. '১৭]*
(ক) স্টার্চ (খ) সেলুলোজ
(গ) গ্লুকোজ (ঘ) কাইটিন

৩১।
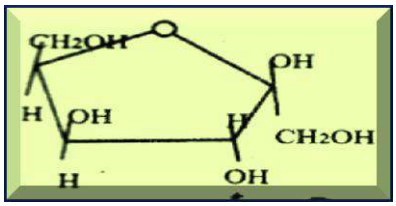

উদ্দীপকের গঠনটি নাম কী? *[ঢা. বো. '১৭]*
(ক) গ্লুকোজ (খ) ম্যানোজ
(গ) ফ্রুক্টোজ (ঘ) গ্যালাক্টোজ

৩২। রক্তে ইউরিক এসিড শনাক্তকরণে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
(ক) পেপসিন (খ) ইউরিয়েজ
(গ) ট্রিপসিন (ঘ) পেপেইন
উদ্দিপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও-
দশ বছরের রিদিতা বয়সের তুলনায় অনেক বেশি রোগা ও দুর্বল। সুস্থ সবল দেহ গঠনে ডাক্তার রিদিতাকে ভাত মাছের সাথে পর্যাপ্ত মাংস, দুধ ও ডিম খাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

৩৩। মাছ ও মাংস জাতীয় খাদ্য-
i. কোষঝিল্লি গঠনে সাহায্য করে
ii. দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধির জন্য কাজ করে
iii. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *ii* ও *iii*
(গ) *i* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

৩৪। কোন প্রোটিনটি বার্লি থেকে পাওয়া যায়? *[চ. বো. '১৭]*
(ক) হরডেউন (খ) গ্লিয়াডিন
(গ) জেইন (ঘ) কাইটিন

৩৫। ডিমের কুসুমে কোন ধরনের প্রোটিন থাকে? *[ঢা. বো. '১৬]*
(ক) গ্লোবিউলিন (খ) গ্লুটেলিন
(গ) অ্যালবিউমিন (ঘ) প্রোলামিন

৩৬। নিচের কোনটি অবিজারক শর্করা? *[য. বো. '১৬]*
(ক) গ্লুকোজ (খ) ফ্রুক্টোজ
(গ) প্রোলামিন (ঘ) সুক্রোজ

৩৭। নখে কোন ধরনের প্রোটিন থাকে? *[সি. বো. '১৬]*
(ক) অ্যালবুমিন (খ) স্ক্লেরোপ্রোটিন
(গ) গ্লোবিউলিন (ঘ) গ্লুটেনিন

৩৮। কোনটি গ্লুকোজের সাথে সমপরিমাণে যুক্ত হয়ে সুক্রোজ গঠিত হয়? *[কু. বো. '১৯]*
(ক) ইরিথ্রোজ (খ) র‍্যাফিনোজ
(গ) রাইবোজ (ঘ) ফ্রুক্টোজ

৩৯। মানুষের চোখের ছানি অপসারণে চোখের লেন্সে যে এনজাইমটি ব্যবহৃত হয়- *[চ. বো. '১৫]*
(ক) পেকাটিন (খ) পেপসিন
(গ) জাইমেজ (ঘ) ট্রিপসিন

৪০। LDL কোন জাতীয় জীব রাসায়নিক উপাদান? *[দি. বো. '১৫]*
(ক) টারপিনস (খ) স্টেরয়েড
(গ) চর্বি (ঘ) তেল

📖 নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং ৪১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

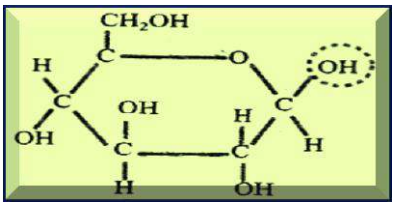

৪১। উদ্দীপকের প্রদর্শিত অণু দ্বারা গঠিত পলিস্যাকারাইড ব্যবহৃত হয়- *[রা. বো. '১৭]*

i. বস্ত্র শিল্পে
ii. বিস্ফোরক হিসেবে
iii. ফটোগ্রাফিতে
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii*
(গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

📖 নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কার্বোহাইড্রেট এক ধরনের জৈব যৌগ যা উদ্ভিদের প্রধান গাঠনিক পদার্থ হিসেবে কাজ করে। পদার্থটি স্বাদহীন, পানিতে অদ্রবণীয় এবং এর কোনো পুষ্টিগুণ নেই।

৪২। উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থের নাম কী? *[ঢা. বো. '১৬]*

(ক) স্টার্চ (খ) সেলুলোজ
(গ) গ্লাইকোজেন (ঘ) ডেক্সট্রিন

📖 নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

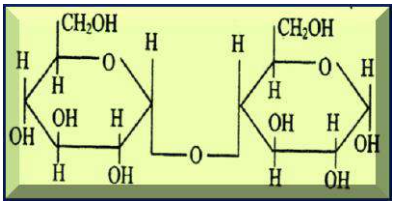

৪৩। উদ্দীপকের যৌগটির নাম কী? *[রা. বো. '১৯]*

(ক) সেলুলোজ (খ) সুক্রোজ
(গ) মল্টোজ (ঘ) সেলোবায়োজ

৪৪। ধাতুযুক্ত জৈব যৌগের রূপটিকে বলা হয়- *[কু. বো. '১৬]*

(ক) এনজাইম (খ) কো-ফ্যাক্টর
(গ) কো-এনজাইম (ঘ) অ্যাপোএনজাইম

📖 নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

পরিবার পরিকল্পনার এক জাতীয় সেমিনারে ডাক্তারগণ অভিমত ব্যক্ত করলেন, শিশুদের সঠিক শারীরিক বৃদ্ধির জন্য ভাত, রুটি, ডিম, মাছ ও মাংস জাতীয় খাদ্য একান্ত প্রয়োজন।

৪৫। মাছ ও মাংস জাতীয় খাদ্য- *[সি. বো. '১৫]*

i. কোষপ্রাচীর গঠন করে
ii. এসিড প্রয়োগে তঞ্চিত হয়
iii. অ্যামিনো এসিড দ্বারা গঠিত
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii*
(গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

৪৬। উদ্ভিদের প্রধান ডাইসাইস্যাকারাইড হলো- *[ডেন্টাল : ১৬-১৭]*

(ক) ম্যালটোজ (খ) ম্যানোজ
(গ) ল্যাকটোজ (ঘ) সুক্রোজ

৪৭। উদ্ভিদের শুষ্ক ওজনের কত (%) কার্বোহাইড্রেট- *[মেডিকেল : ১০-১১]*

(ক) ৫০-৮০ (খ) ৩০-৪০
(গ) ৪০-৮০ (ঘ) ২০-৫০

৪৮। সরল লিপিডের উদাহরণ নয় কোনটি? *[মেডিকেল : ১৫-১৬]*

(ক) চর্বি (খ) তেল
(গ) রাবর (ঘ) মোম

৪৯। প্রোটিন থেকে মোট কতটি অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায়? *[মেডিকেল : ০৪-০৫]*

(ক) ৮ (খ) ২০
(গ) ২৬ (ঘ) ৬৪

৫০। প্রোটিন গঠনের প্রকারভেদ নিচের কোনটি? *[মেডিকেল : ১১-১২]*

(ক) দুই (খ) পাঁচ
(গ) চার (ঘ) তিন

৫১। নিম্নের কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার উপরে এনজাইম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে? *[মেডিকেল : ১০-১১]*

(ক) ৩০ (খ) ৪০
(গ) ৫০ (ঘ) ২০

৫২। কোন তথ্যটি এনজাইমের জন্য সঠিক নয়? *[মেডিকেল : ০৪-০৫]*

(ক) খুব অল্পমাত্রায় উপস্থিত থেকে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে
(খ) এনজাইম কলয়েডের মতো
(গ) কার্যকারিতা pH দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়
(ঘ) কার্যকারিতা নির্দিষ্ট নয়

📖 সঠিক উত্তর : অনুশীলনী-৩ 📖

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ক	গ	ক	খ	গ	ক	গ	ক	ক	ক	ক	ঘ	খ	খ	ক	ক	খ		ক	ক
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০
ক	ক	ক	খ	ক	গ	খ	ক	ক	খ	গ	খ	খ	ক	ক	ঘ	খ	ঘ	ঘ	খ
৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	*	*	*	*	*	*	*	*
ঘ	খ	গ	খ	ঘ	ঘ	ক	গ	খ	ঘ	গ	ঘ	*	*	*	*	*	*	*	*